ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬৩ বর্ষ ৯ সংখ্যা ।। ২৮ কার্তিক, ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ১৫ নভেম্বর ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

রাজনৈতিক স্বার্থেই সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মতো দেশপ্রেমিক ও সমাজসেবী সংগঠনকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। সঙ্ঘের সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন, 'সঙ্ঘ সন্ত্রাস এবং হিংসায় বিশ্বাস করে না। তবে নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সঙ্ঘ সবরকম সহযোগিতা করবে।' তারপরও দেখা গিয়েছে সরকার সেইমতো কাজ করছে না। হিন্দু, হিন্দুত্ব এবং সঙ্ঘকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র চলছে। গত ৮ নভেম্বর কলকাতায় সঙ্ঘের পূর্ব ক্ষেত্রের কার্যালয় কেশব ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরের কথাগুলি বলেন, সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচারক প্রমুখ শ্রীমদনদাসজী। এই ষড়যন্ত্র

কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে মদনদাসজী।

কংগ্রেস দল না, ইউ পি এ সরকার, কে করছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মদনদাসজী বলেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'স্যাফ্রন টেররিজম্'-এর কথা বলেছেন সংসদে আর দলের সাধারণ সম্পাদক রাহুল গান্ধী 'সিমি' এবং আর এস এস-কে একাসনে বসিয়ে সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করার কথা তুলেছেন। তিনি আরও বলেন, 'রামজন্মভূমি' নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের

(এরপর ৪ পাতায়)

নিরপেক্ষতার বদলে বিদ্বেষমূলক তদন্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ যোশী গত ২৬ অক্টোবর এক বিবৃতিতে রাজস্থান এ টি এস (অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড)-এর পেশ করা চার্জশীটে সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকরীমণ্ডলের বরিষ্ঠ সদস্য ইন্দ্রেশকুমারের নাম টেনে আনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন। সঙ্ঘের প্রধান কার্যালয় নাগপুর থেকে জারি করা এই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের কিছু রাজনৈতিক নেতা ও তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা জেনেশুনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও তার কার্যকর্তাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও তদন্তকারী সংস্থাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। শ্রী যোশী বলেছেন, ''বিস্ফোরণের বিভিন্ন ঘটনায় তদন্তকারী রাজস্থান পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াড গত ৩০ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বিভাগ প্রচারক দেবেন্দ্র গুপ্তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। তখনই আমি বলেছিলাম, সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তদন্তকারী সংস্থাকে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা হবে। আমি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্তদের বিষয়ে যেন নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করা হয়।

আমার কথার ভিত্তিতে আমাদের কার্যকর্তারা তদন্তকারী সংস্থাকে বিগত কয়েকমাসে সবরকম সাহায্য করেছেন। তাঁরা আশা করেছিলেন, তদন্তকারী সংস্থা নিরপেক্ষভাবেই কাজ করবেন। এসময়ে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে অনেক রকমের অপমানও সহ্য করতে হয়েছে। কিছু কিছু অত্যুৎসাহী অফিসারদের কারণে শারীরিক

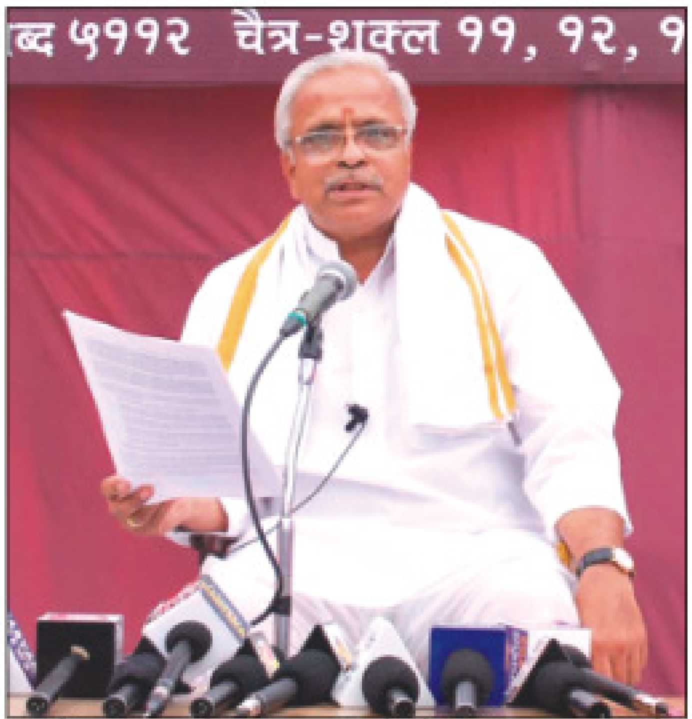

আজমীর ও হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের তদন্তের পরিপ্রেক্ষিতে এমনই মন্তব্য সুরেশ যোশীর।

এবং মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। তবুও আমরা এই ভেবে সবকিছু সহ্য করেছি যে তদন্তকারী সংস্থা নিজের কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন। সেজন্য কার্যকর্তাদের উপর কমবেশি শারীরিক ও মানসিক নিপীড়ন উপেক্ষা করেছিলাম। কিন্তু কিছুদিন আগেই আজমীর বিস্ফোরণের ঘটনায় রাজস্থান এ টি এস-এর চার্জশিট এবং অব্যবহিত পরেই তদন্তকারী সংস্থা এবং রাজনৈতিক নেতাদের যুগপৎ বিবৃতিতে আমাদের 'নিরপেক্ষ তদন্তের ধারণা' ভুল প্রমাণিত হয়েছে। অযৌক্তিকভাবে এবং সবদিক বিচার-বিবেচনা না করেই সঙ্ঘের নাম জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রমাণ ব্যতিরেকেই সঙ্ঘের বরিষ্ঠ কার্যকর্তা ইন্দ্রেশকুমারের নাম বলা হচ্ছে। এসব দেখে মনে হচ্ছে তদন্ত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সেখানে সততা এবং নিরপেক্ষতার স্থান নেই।

চার্জশিট দেখে মনে হচ্ছে, সেখানে

(এরপর ৪ পাতায়)

কাশ্মীরী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মাওবাদীদের হামলার মুখে জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুবরা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অরুন্ধতী রায়ের স্লোগান, 'ভুখে-নাঙ্গে হিন্দুস্থান সে কাশ্মীর কো আজাদ করো'-এর সার্থক প্রতিফলন এবার দিল্লীর পর দেখা গেল কলকাতায়। দিন আগেই রাজধানী দিল্লীতে 'আজাদী' শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রে ওই স্লোগান তুলেছিলেন অরুন্ধতী রায়-রা। কলকাতার বুকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও ওই একই

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

আহত যাজ্ঞিক ও নীরজ।

আর এর প্রতিবাদ করতে গিয়েই কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী ও এ রাজ্যের মাওবাদীদের রোষের মুখে পড়তে হলো জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুবদের। ঘটনার সূত্রপাত গত ৩০ নভেম্বর। অকুস্থল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরস্থ বিবেকানন্দ হল। এই ঘটনার ৯ বিষয়ে 'আজাদী' নামে দিয়েই কাশ্মীরের স্বাধীনতার পক্ষে জোরদার সওয়াল করার লক্ষ্যেই ৩০ নভেম্বর আয়োজিত হয় আলোচনা চক্রটি। আয়োজক হিসেবে কাগজ-কলমে যাদেরই নাম থাক না কেন, অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিল মাওবাদীদের প্রকাশ্য ছাত্র সংগঠন ইউনাইটেড স্টুডেন্টস্ ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (ইউ এস ডি এফ)। এদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জেহাদী গোষ্ঠী-ও ছিল এই আলোচনা-চক্রের অন্যতম হোতা। যে কারণে সংসদ-ভবন হামলার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত এস এ আর গিলানী এতে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা সিদ্ধার্থ গুহ-রায় তাঁর বক্তব্যে কাশ্মীরকে একটি স্বাধীন রাজ্য হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা (অপ) করেন এবং তাকে ভারতবর্ষ থেকে অবিলম্বে মুক্ত করা উচিত বলে অভিমত প্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত, গোটা বিবেকানন্দ হলেই যে সমস্ত পোস্টার ব্যানার ঝুলতে দেখা গেছে তাতে কাশ্মীরের 'আজাদী' (স্বাধীনতা)-র পক্ষে জোরালো সওয়াল করে লেখা হয়েছিল। সিদ্ধার্থবাবুর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রতিবাদ উঠে আসে অনুষ্ঠানের শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে। অনুষ্ঠানটির শ্রোতা অরুণ সাউ সরাসরি প্রতিবাদ করে সিদ্ধার্থবাবুকে বলেন, 'আপনি

(এরপর ৪ পাতায়)

বিদেশী পর্যটকের মুখোশে ধর্মান্তরকরণের চেষ্টা বানচাল

কৃশানু মিত্র।। কলকাতায় ব্যাপটিস্ট চার্চ আয়োজিত চারদিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠানে বিদেশী পর্যটক ভিসায় এসে রীতিমতো খৃস্টধর্মের প্রচার ও ধর্মান্তকরণের চেষ্টা চালিয়ে গেল একদল বিদেশী। ভিসা আইন ভঙ্গকারী এইসব বিদেশী পর্যটক ও তাদের মদতদাতা ব্যাপটিস্ট চার্চের বিরুদ্ধে গত ২০ অক্টোবর কলকাতায় এন্টালী এলাকায় জোড়া গির্জার সামনে বিশ্ব হিন্দু

কলকাতায় ব্যাপটিস্ট চার্চ আয়োজিত জলসা

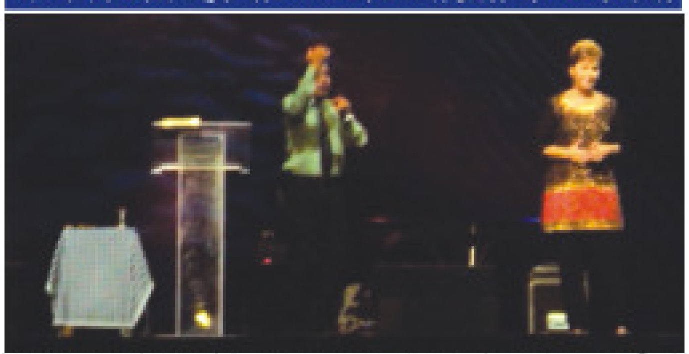

পরিষদের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়। উল্লেখ্য, ভিসা আইন ভঙ্গকারী এইসব বিদেশীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে আপত্তি জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বরং 'ফেস্টিভ্যাল অফ লাইফ' শীর্ষক উদ্দাম নাচ-গানের জলসায় যোগ দিয়ে ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে তারা উঠতি যুবক-যুবতীদের দলে টানার চেষ্টাও করে।

মূল পরিকল্পনা অনুসারে ভারত-জুড়ে পাঁচ লাখ হিন্দু ও এক লক্ষ মুসলমানকে খৃস্টান করার চক্রান্ত হয়েছিল। বিদেশ থেকে এসেছিলেন—

(এরপর ৪ পাতায়)

নির্বাচনের মুখে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ সিপিএম

নিশাকর সোম।। শাসক শিবিরের প্রধান চালক সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির দু'দিনের সভা সম্প্রতি হয়ে গেল। রাজ্যের সমস্ত জেলার রাজনৈতিক সাংগঠনিক পরিস্থিতির সাল তামামির পর নির্বাচন হলে সেই জেলায় পার্টির কী অবস্থা হবে সেটাই ছিল আলোচ্য বিষয়।

সভার দু'দিন বাদে রাজ্য-কমিটির একাধিক সদস্যের সঙ্গে কথা বলে বোঝা গেল যে-খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়নি। কারণটা হচ্ছে— পার্টির জমায়েতে লোক বাড়ানোর সাময়িক ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া গেলেও আদতে কিন্তু মানুষজন এখনও পার্টির রাজনীতির আকর্ষণে নয়, বরং খানিকটা 'ভয়ে-ভীতিতে' আসছেন। আর সেইসব সভার নেতারা যা বলছেন সে সম্বন্ধে রাজ্য-কমিটির সভার অধিকাংশ সদস্যই সমালোচনা করেছেন। বিশেষত মুখ্যমন্ত্রী তথা পলিটব্যুরো সদস্য বুদ্ধবাবুর দম্ভোক্তি 'কে তাদের বাঁচাবে?' —এ নিয়ে রাজ্য-কমিটির অনেক সদস্যই সমালোচনা করেছেন। তেমনি বিমানবাবু শ্যামলবাবু, সেলিম এবং রেজ্জাক মোল্লার কথাও সমালোচিত হয়েছে।

তবে একথাও সভায় অনেকেই বলেছেন যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রেজ্জাক মোল্লা শূন্যগর্ভ কলসীর আওয়াজ দেন না।

প্রসঙ্গত একমাত্র রেজ্জাক মোল্লাই বলেছেন, তাদের জেতা আসন রক্ষা করতে পারবেন। এ কথাও শোনা গেল, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নতুন সম্পাদক সুজন চক্রবর্তী সব গোষ্ঠীর সাহায্য নিয়েই চলার চেষ্টা করছেন। বিশেষ করে তিনি রেজ্জাক-কান্তি গোষ্ঠীকে সঙ্গে নিয়েই চলতে চান। কারণ তিনি জানেন, তিনি জেলা কমিটিতে সংখ্যালঘু।

এছাড়া বাঁকুড়া ও পূর্ব মেদিনীপুরের দুই নেতা যথাক্রমে অমিয় পাত্র এবং দীপক সরকার তাঁদের জেলায় জেতা আসন বজায় থাকবে বলে জানিয়েছেন। এরকম কথা আর কোনও জেলাই জোর দিয়ে বলতে পারেনি। তবে এই দুই নেতা একথা বললেও বাঁকুড়ায় বর্তমান মন্ত্রী পার্থ দে-র জেতার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। কাশীনাথ মিশ্র তাঁকে কঠিন লড়াইয়ে ফেলবেন।

আবার মেদিনীপুরে দীপক সরকারের মারদাঙ্গা নীতির পাল্টা কিছু হতে পারে। কারণ নির্বাচনের আগে হয়ত কিছু সময়ের জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রত্যাহার করে নেওয়া হতে পারে। এছাড়া পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর ও তৃণমূলের 'প্রতিরোধ বাহিনী' গড়ে তুলছেন। শুভেন্দুবাবুর কথায় 'যৌথ বাহিনী সরে গেলে সিপিএম ফুৎকারে উড়ে যাবে।' এছাড়া পূর্ব-পশ্চিম উভয় মেদিনীপুরেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট। এ সম্পর্কে বিমানবাবুর দাওয়াই— দীপক সরকারকে রাজ্য-সম্পাদকমণ্ডলীতে রেখে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে ওঠার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঁকুড়াতেও পার্থবাবু পার্টিতে কোণঠাসা। তিনি খানিকটা নিস্পৃহ হয়ে গেছেন।

এছাড়া পুরুলিয়া জেলার সাংগঠনিক ব্যবস্থাকে 'মেরামত' করার জন্য সদ্যোত্থিত পার্টির রাজ্য-কমিটির সদস্য— রবীন দেব-কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার পার্টি সম্পাদক অশীতিপর নেতা নকুল মাহাতো-কে সামনে রেখে নিখিল মুখার্জিকেই জেলার মূল দায়িত্ব দিতে চান রবীনবাবু।

এখানে মজার কথা হলো, বিলাসীবালা সহিস-কে মন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে এনে জেলা সভাধিপতি করা হলেও তাঁকেই আবার বিধানসভায় দাঁড় করাতে হবে বলে জানিয়েছেন নকুল মাহাতো। নকুলবাবু বরাবরই পার্টি নেতৃত্বের কথা মেনে চলেন। তবে বিমান বসু-কে বাঁকুড়ার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে আনার ব্যাপারে নকুলবাবুর ইচ্ছা পূরণ হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই দলাদলি। এর মধ্যে আবার জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলায় চরম অবস্থা। সমালোচনার মুখে মানিক সান্যাল এবং মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। প্রসঙ্গত মালদহ জেলার মন্ত্রী শৈলেন সরকার-কে পার্টি বস্তুত মারার অবস্থায় নিয়ে গেছে।

সিপিএম-এর রাজ্য-কমিটির সভায় জেলার অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা পার্টির যে 'অগ্রগতি'র কথা বলেছেন— তা একেবারেই সাবজেকটিভ। আগের থেকে সভায় বেশি লোক হওয়া মানে এই নয় যে পার্টির দিকে হাওয়া ঘুরছে। হাওয়া ঘোরানোর ব্যাপারে শুধু সভায় বিরোধী নেত্রী সম্পর্কে কুৎসিত কথা বললেই হাওয়া ঘোরে না। আদতে সিপিএম এতদিন তো ম্যাসলম্যান দিয়েই ভোট করিয়েছে— জনমতের ধার ধারেনি। তার ফল পেতেই হবে। সে ফল অমিয় পাত্র, রেজ্জাক মোল্লারা ঠেকাতে পারবে না। আর একটা কথা। জেলা-সম্পাদকরা রিপোর্টে অগ্রগতি তো দেখাবেনই। তা'নাহলে তো তাঁদের অপদার্থতা প্রমাণ হয়ে যাবে। আজকে রাজ্য কমিটিতে ভিন্ন সুরে কথা বলার লোক নেই— রেজ্জাক মোল্লারও কণ্ঠরুদ্ধ। জেলার রিপোর্টও তো লোকসভা, পঞ্চায়েত এবং পুরসভা নির্বাচন জেতাতে পারল না। আমার মনে পড়ে যাচ্ছে, সোভিয়েত ইউনিয়নে ঊনবিংশ পার্টি কংগ্রেসে পঞ্চবার্ষিকী যোজনার বদলে ২০ বছরের যোজনার নকশা গৃহীত হয়। তাতে দেখানো হয়েছিল ২০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে চলে যাবে। কিন্তু সকলি গরল ভৈল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার। গর্বাচভ-কে দায়ী করা হয়। এখানে কে দায়ী— কারাত? সোনিয়ার আঁচল ত্যাগ করার জন্য? বুদ্ধদেব-টাটা-কে বন্ধু করে কৃষক-স্বার্থ বিরোধী কাজ করার জন্য? বিমান বসু— যিনি শুধুই বাজে বকেন— এক ইঞ্চিও কারুর উপকারে নেই— সেই তিনি? যতই সিপিএম-এর রাজ্যনেতৃত্ব গোলাপি সম্ভবনার কথা পার্টি কর্মীদের সামনে তুলে ধরুন— তাতে দীপক সরকার-সূর্যকান্ত মিশ্র-এর দ্বন্দ্ব মিটবে না। উত্তর ২৪ পরগণায় অমিতাভ নন্দীর সঙ্গে বিরোধী গোষ্ঠীর লাঠালাঠি থামবে না। যতই চাপা দেওয়ার চেষ্টা হোক, লক্ষ্মণ শেঠ ও তাঁর পরিবার পরিজনগোষ্ঠীর অত্যাচারের কথা মানুষ এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারেনি।

উল্লেখ্য, কেন্দ্র সরকার রাজারহাট টাউনশিপ-কে স্যাটেলাইট টাউনশিপ ঘোষণা করায় এই প্রজেক্টের যাবতীয় খরচের ২০ শতাংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে। জওহরলাল নেহরু ন্যাশন্যাল আরবান রিনিউয়াল কমিশনের তহবিল থেকে প্রজেক্টের মোট খরচের ২০ শতাংশ কেন্দ্রীয় 'অনুদান' হিসেবে হচ্ছে। বাকি খরচ হিডকো দেবে। এখন তো সিপিএম-এর শিরে হইল সর্পাঘাত তাগা বাঁধবি কোথা?

ঠিক এই অবস্থা উপলব্ধি করে প্রকাশ কারাত তথা সিপিএম-পলিটব্যুরো সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতাদের পার্টিক্লাস ডিসেম্বর মাসে হবে।

এরাজ্যে দুর্নীতিগ্রস্তদের বহিষ্কার করতে ২-৩ বছর লাগে— কারণ তাঁরা নেতা-নেত্রীর ভালবাসার পাত্র!

সিপিএম-এর রাজ্য কমিটিতে পার্টি-নেতাদের খুশি করার রিপোর্ট পেশ করাটাই একটা ব্যবস্থা। সভার শুরুতে সম্পাদক-মণ্ডলীর পেশ করা রিপোর্টে সুর বেঁধে দেওয়া হয়— সেই সুরেই গান গাইতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন-এর কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে নিকিতা সার্গিয়েভ ক্রুশ্চেভ যখন স্তালিনের অত্যাচারের কাহিনী বলছিলেন— তখন পেছন থেকে একজন প্রতিনিধি বলে উঠেছিলেন— "আপনি তখন কি করছিলেন?" ক্রুশ্চেভ বলেন 'কে একথা বললেন— উঠে দাঁড়ান!' কেহই উঠে দাঁড়ানোর সাহস দেখাননি। তখন ক্রুশ্চেভ বলেছিলেন— "বুঝুন অবস্থা এখন তো মৃত্যুভয় নেই— তবু কেউই সাহস করে দাঁড়াতে পারলেন না। তখন তো চরম শাস্তির ভয় ছিল।" এই হচ্ছে কমিউনিস্ট দলের সাধারণ-সদস্যদের আতঙ্কের পরিবেশ!

এ সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রধান নেতা কে-জি বসু বলেছিলেন "কৃষকনেতা আবদুল্লা রসুল কোনও এক পার্টিকংগ্রেসে পশ্চিমবঙ্গের পার্টি সংগঠন সম্পর্কে বলেছিলেন— 'জেন্টল কলোসাস উইথ ক্লেফিট।' এই বলার দরুণ তাঁকে রাজ্য-কমিটির সভায় নিন্দিত হতে হয়। দুঃখ প্রকাশ করতে বাধ্য হন।" কে-জি আরও বলেছিলেন যে, তাঁর স্ত্রী পারুল বসু রাজ্য-নেতৃত্বে প্যানেলের বিরুদ্ধে কমিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পার্টিতে একঘরে হয়েছিলেন। পার্টিতে নেতৃত্বের প্যানেলের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কার্যত নিষিদ্ধ। ধন্য পার্টি গণতন্ত্র।

আর এস এসের অখিল ভারতীয় কার্যকরীমণ্ডলের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মণ্ডলের বৈঠক গত ২৯ থেকে ৩১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রের জলগাঁও-এ হয়ে গেল। সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত এই বৈঠকে পুরো সময় উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকে তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাবটির বিষয় হলো— কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গটি রাষ্ট্রবিরোধী। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশততম জন্মবার্ষিকী— এই দুই প্রসঙ্গে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই সময়

ইতিহাসে বিজ্ঞান

একে ইতিহাসে বিজ্ঞান বলবেন না বিজ্ঞানের ইতিহাস— সেটা নিয়ে বরং গবেষকরাই গবেষণা করুন। কিন্তু রবার্ট রিটনার 'প্রাচীন মিশর' গ্রন্থে যে চমকপ্রদ তথ্যটি সরবরাহ করেছেন তা হলো— মিশরের বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র সেখানকার 'ফারাও' (শাসন কর্তা) তুতেনখামেন নাকি বুকের ক্ষতে বিস্তর কষ্ট পেয়েছিলেন। সম্ভবত, সেই কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। লেখক রবার্টের এহেন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কারণ ইতিপূর্বে তুতেনখামেনের মমিতে এক্স-রে এবং সিটি স্ক্যান করে দেখা গিয়েছিল সেখানে হৃৎপিণ্ড, হৃদযন্ত্রের দেওয়াল, স্টারনামের সামনের অংশ এবং তৎসংলগ্ন পাঁজরের হাড়গুলো উধাও হয়ে গিয়েছে। লেখকের মনে হয়েছে, 'মানুষের হৃৎপিণ্ড হলো সেই জিনিস যা মানুষের আবেগ, স্মৃতি এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত। এটা ইচ্ছাকৃতভাবে তুতেনখামেনের দেহ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

স্বাস্থ্য বাঁচাতে

কথায় বলে কর্মই জীবন। কিন্তু অতিরিক্ত কর্ম যে আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকারক সেটা নিশ্চয় আপনি জানেন না কিংবা মানেন না! অফিসের চেয়ারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে আপনি হয়তো অনায়াসেই হয়ে উঠতে পারেন আপনার বসের প্রিয়পাত্র। দেখাতে পারেন আপনার কর্মের প্রতি সততাও। কিন্তু এর ফলে যে আপনি নিজের জীবনে ডেকে আনছেন এক চরম বিপদ সেটা নিশ্চয়ই আপনার অজানা। সম্প্রতি, নিউজিল্যান্ডের একটি মেডিক্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের গবেষণা অনুযায়ী, যারা প্রতিদিন অফিসে বসে একটানা ১০ ঘণ্টা কাজ করেন, নিজেদের পেশার প্রতি পেশাদারিত্ব দেখালেও চরম অবিচার করছেন তাঁরা তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি। এর ফলে তাঁদের শরীরের ধমনীর অভ্যন্তরস্থ পথরোধ করতে পারে জমাট বাঁধা রক্ত। চিকিৎসা-শাস্ত্রে যার পরিচয় 'ভেন থ্রম্বোসিস' হিসাবে। এক্ষেত্রে ৩ গুণ ক্ষতির সম্ভাবনা তাঁদের ক্ষেত্রে যাঁরা দু'ঘণ্টাও নিজেদের আসন ছেড়ে না উঠে একটানা বহুক্ষণ (অন্তত ১০ ঘণ্টা) ধরে কাজ করে যান। গবেষণাটির নেতৃত্বে থাকা রিচার্ড বিসলের মন্তব্য, যাঁরা দীর্ঘ সময়ের বা দীর্ঘপথের উড়ান চালান তাঁদের ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগের সম্ভাবনা প্রবল।

সস্তা

আপনি কি জানেন, বর্তমানে একটি মোবাইল ফোনের চেয়ে এক কাপ কফির দাম বেশী? শুনতে হাস্যকর বা অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই সত্যি। এমনটাই দাবি করেছেন বৃটেনের মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী কারফোন ওয়ারহাউস। তাঁর মতে, ও টি ২০৯ নামক মোবাইল ফোনটি ইতিমধ্যে বৃটেনের বাজারে বিপুল চাহিদার প্রমাণ দিয়েছে। মোবাইল ফোনটি প্রস্তুত করেছে ফরাসী সংস্থা আলকাটেল। বৃটেনে বিক্রয় হওয়া মোবাইল ফোনের মধ্যেই এটিই সবচেয়ে সস্তা এবং এককাপ কফির চাইতেও কমদামী। বৃটেনের মুদ্রে মোবাইলটির দাম ৯৯ পেন্স। প্রশ্ন এখন একটাই— সস্তার তিন অবস্থা না হয়!

নারী সুরক্ষা

সরকারি বা বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত যেসব মহিলাদের প্রত্যহ কোনও না কোনও শারীরিক নির্যাতন সহ্য করতে হয় তাদের জন্য সুখবর আনতে চলেছে একটি বিল। খুব শীঘ্রই মহিলাদের সুরক্ষার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের উদ্যোগে সংসদে পাশ হতে চলেছে কর্মস্থলে নারীদের যৌন নিগ্রহ রুখতে ওই বিলটি। তবে এই বিল শুধুমাত্র বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত মহিলা কর্মীদেরই নয়, সংস্থার ভিতরে কোনও বিশেষ দরকারে প্রবেশ করছেন এমন বহিরাগত মহিলাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে সেটি। বর্তমানে যেসব মহিলারা নিজেদের পেশার তাগিদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাড়ির বাইরে কাটান তাদের নিরাপত্তার অভাব ঘোচাতেই মূলত এই পদক্ষেপ। তবে বিলটিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে দায়বদ্ধ থাকতে হবে সংস্থার মালিকপক্ষকেও। কোনও সংস্থার মালিক যদি তাঁর মহিলা কর্মীর অভিযোগ এই বিষয়ে না গ্রহণ করেন তবে মালিকের বিরুদ্ধেও ধার্য হতে চলেছে ৫০ হাজার টাকার জরিমানা। অভিযোগকারিণীর অভিযোগ ৯০ দিনের মধ্যে খতিয়ে দেখে সেটা কার্যকর করতে হবে পরবর্তী ৬০ দিনের মধ্যে। তবে বিলটির অপব্যবহার যাতে না করা হয়, সেই ব্যাপারেও আইনের বিধিনিষেধ আরও জোরদার করা দরকার বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

বিপর্যস্ত লেকটাক

মণিপুর সরকারের উদাসীনতায় এবার ধ্বংসের পথে মণিপুরের ঐতিহাসিক হ্রদ 'লেকটাক লেক।' উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই বৃহত্তম হ্রদটির উপর নির্ভরশীল মণিপুরের কয়েকশো মানুষের জীবিকা, এমনকি বন্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের কাছেও লেকটি তাদের নিরাপদ বাসস্থান হিসেবেই প্রতিভাত। কিন্তু বর্তমানে রাজ্য সরকারের গাফিলতির দরুণ খেসারত দিতে হচ্ছে মণিপুরের সাধারণ মানুষকে। বিষাক্ত হয়ে উঠেছে হ্রদটির পানীয় জল। এমনকি লেকের অনেকাংশে গজিয়ে উঠেছে স্থানীয় ভাষায় যাকে বলে 'ফুমডিস' বা শ্যাওলার স্তর। প্রসঙ্গত, হ্রদটির উন্নতিসাধনের স্বার্থে ১৫ বছর আগে মণিপুর সরকার গঠন করেছিল লেকটাক ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এল ডি এ)। যদিও এরপর বহু অর্থ ব্যয় করা হলেও সেভাবে হাল ফেরেনি লেকটাকের। বর্তমানে লেকটির অবস্থা ফেরাতে যোজনা কমিশন বরাদ্দ করেছে ২২৪ কোটি টাকা। এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কে প্রো ইনফ্রা ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড নামক একটি বেসরকারি সংস্থাকে। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়ে জানান ইতিমধ্যেই লেকের জল পরিষ্কার ও লেকটির অবস্থা ফেরাতে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

সাপের বংশবৃদ্ধি

পুরুষের সাহায্য ছাড়াই জন্ম দেওয়া যেতে পারে নিজের সন্তানের। পার্থেনোজেনেসিস্ বা অক্ষতযোনি গর্ভজাতের এই সম্ভাবনাটি (নলজাতকে'র ব্যাপারটা আলাদা) মানুষের ক্ষেত্রে এখনও তেমনভাবে প্রমাণিত না হলেও, সাপেদের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশ প্রযোজ্য। সম্প্রতি আমেরিকা রেলিগের উত্তর ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির একটি গবেষকদল বোয়া কনস্ট্রিকটর প্রজাতির সাপের ক্ষেত্রে দেখেছেন যে অক্ষতযোনি গর্ভজাতের দ্বারাই তারা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। তাঁরা দেখেছেন ওই বিশেষ প্রজাতির মহিলা সাপের জন্ম দেওয়া প্রত্যেকটি বাচ্চাই স্ত্রীলিঙ্গ। এমনকি যেখানে বাচ্চাগুলোর জন্ম হয়েছে সেখানে কোনও পুরুষ জিনেরও সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাই এক্ষেত্রে বাচ্চাগুলি যে পিতৃহীন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গবেষকদলটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ওয়ারেন বুথ। তিনি মহিলা বোয়া কনস্ট্রিকটরটিকে আমেরিকার একটি অনলাইন দোকান বোয়া স্টোরে এ নিয়ে গবেষণা চালান।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ওবামার ভারত-দর্শন

ওবামা আমেরিকার ক্ষমতায় বসিবার দুই বৎসরের মাথায় ভারত দর্শনে আসিলেন। ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে প্রাত্যহিক ও বাস্তবিক জ্ঞান সঞ্চ য় করিতেই কী তিনি আসিয়াছেন? আসিলে ভাল কথা! কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কী সত্যই ভারতকে জানা? ভারতীয় দর্শন জানা? এমনোতর বহু প্রশ্নই আজ উঠিয়া আসিয়াছে। যাহার জন্য ওবামাসাহেবকেও খানিকটা দায়ী করা চলে। গত ৮ নভেম্বরের সন্ধ্যায় সংসদের সেন্ট্রাল হলে তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে 'বহুত ধন্যবাদ' এবং অন্তিমে 'জয় হিন্দ' সম্ভাষণ আপামর ভারতবাসীর চিত্ত বিগলিত করিয়াছে। ইতোমধ্যে বঙ্গবাসীর পাওনা কিঞ্চি ৎ উপরি। ওবামা-র মুখ-নিঃসৃত 'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির' শুনিয়া রবীন্দ্রপ্রেমী বাঙ্গালীর হৃদয় যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে আর আশ্চ র্যের কি-ই বা আছে? শতাধিক বর্ষ পূর্বেকার কপর্দকশূন্য কৌপীনধারী ভারত-পথিক বিবেকানন্দের আমেরিকা-জয় করা বাণী প্রায় সোয়া এক শতাব্দী পরে স্বয়ং সে দেশের প্রধান ব্যক্তিটির মুখে স্বীকৃতি পাইলে, এমন কোন পাষাণেতর ভারতবাসী আছেন, যাহার চোখ দ্বারা আনন্দাশ্রু বহিবে না? বক্তৃতায় ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব আম্বেদকর এবং গান্ধীজী-র প্রতি বারংবার স্মরণ যে ওবামাকে ভারতবাসীর অশেষ ধন্যবার্দাহ করিয়া রাখিবে তাহা বলাই বাহুল্য। বিশেষত পঞ্চ তন্ত্রের কথা এবং গণিতে 'শূন্য' সংখ্যার অবদান যে প্রাচীন ভারতবর্ষেরই—একথা বলিয়া বারাক ওবামা যে ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেই চাহিয়াছেন, ইহা লইয়া সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু আবেগের প্রশ্নটি স্বতন্ত্র। তাহা যুক্তির ধার ধারে না।

যুক্তিটি সহজবোধ্য। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারততীর্থে স্রেফ ভ্রমণ করিতে আসেন নাই। আসিয়াছেন কূটনীতি করিতে। ইহা নিদারুণ কূটনীতি। ওবামা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সালে চিকাগো শহরের ভূমিতে দাঁড়াইয়া যে প্রাচীন গৌরবময় সমৃদ্ধ শালী ভারতবর্ষের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ শতাধিক বৎসর পরে বিশ্বায়ণের ছোঁয়াচ বাঁচানো সেই ভারত বিশ্ব-অর্থনৈতিক মন্দার বাজারে আপন অর্থনীতিটিকে অন্তত কিছুটা হইলেও টিকিয়া রাখিতে পারিয়াছে। আর কিছু না হউক তিনি বুঝিয়াছেন, ঐতিহ্যময় ভারতবর্ষের একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত রহিয়াছে। যাহার দরুণ বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বাড়িয়া ওঠা বাজারগুলোর মধ্যে সেরা ভারতবর্ষের বাজারটিকে ধরিতে চাহিয়াছেন তিনি। এভাবেই অর্থনৈতিক মন্দার পর বেকারত্বে জর্জরিত আমেরিকাকে বেকারত্ব থেকে মুক্তি দিবার স্বপ্নও দেখিয়াছেন ওবামা।

কিন্তু বিনিময়ে ভারত কি পাইবে? কাশ্মীর নিয়ে চোখরাঙানি, ২৬/১১-এর মতো জেহাদী দৌরাত্ম্য বা আরও কিছু—এই তো? এবারের ভারত-সফরে বারাক ওবামা অবশ্য এ নিয়ে যাহা কিছু বলিয়াছেন তাহা যেমন ভারতবর্ষের স্বার্থবাহী, তেমনি পাকিস্তানকেও চাপে ফেলিবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রশ্নটা এখানেই, ইহা কি ওবামার নিদারুণ কূটনীতিরই অঙ্গ? কারণ ভারতবর্ষকে যদি তিনি কেবলমাত্র 'বাজার' হিসাবেই দেখেন তবে পাকিস্তানকে যে কৌশলগত শরিক হিসাবেই দেখিবেন, তাহাতে আর আশ্চ র্যের কি? সন্দেহ জোরদার হইয়াছে কারণ, আর্থিক মন্দায় তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে 'আউট সোর্সিং'-এর কারণে মার্কিনিদের চাকরি খোয়ানোর জ্বালা ভুলিতে না পারিয়া তিনি এদেশের তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পের রাজধানী ব্যাঙ্গালোরে পদার্পণ করার সৌজন্যটুকু পর্যন্ত দেখাননি। একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে ওবামা বণিকের মানদণ্ড লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেও এদেশে একটা অদৃশ্য রাজদণ্ড প্রতিস্থাপনের সূক্ষ্মভাবনা আগাগোড়াই তাঁহার মস্তিষ্কে রহিয়াছে। যে কারণে কাশ্মীরকে 'বিতর্কিত বিন্দু' বলিয়া ভারত সফরের মধ্যেই পুনরায় অবাঞ্ছিতভাবে নাক গলাইয়াছেন এব্যাপারে। এমনকী, এ নিয়ে 'তৃতীয় পক্ষ' হইতেও অন্যায্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তিনি। সুতরাং সাধু সাবধান।

অতএব আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আবেদন এবং সাবধানবানী আমরা পৌঁছাইয়া দিতেই পারি যে ভারত সরকার যেন এক বণিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের সঙ্গে বণিক-সুলভ আচরণই করিয়া থাকে। বাণিজ্যে ভারসাম্য যেন রক্ষিত হয়। ভারতকে যেন কোনও মতেই মার্কিন পণ্যের বাজারে পরিণত করা না হয়। ভারতীয় রপ্তানী বাণিজ্য পণ্যে অহেতুক সুবিধাদি দেওয়া না হয়। মার্কিন বাজার যেন ভারতীয় বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। আমরা জানি মার্কিনীরা বরাবরই তাহাদের আর্থিক সঙ্কটের যূপকাষ্ঠে ভারতকেই বলি দিয়াছে। এ উদাহরণও ভুরি ভুরি দেওয়া যাইতে পারে। কখনও শিশু শ্রমিক, কখনও পরমাণু চুক্তি, কখনও শিল্প ও কৃষি পণ্যে গুণমানের প্রশ্ন তুলিয়া তাহারা বারবারই ভারতীয় পণ্য-বাণিজ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছে। ভারতের পিঠ চাপড়াইলেই ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবে না। ভারতকে হইতে হইবে বাস্তববাদী। ভারতের চাই অকৃত্রিমবন্ধু, দুই নৌকায় লগি ঠেলা বন্ধু আমরা চাই না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

আধুনিক পৃথিবীতে এসে আজ আমরা এমন কতকগুলি বাস্তব অবস্থার সম্মুখীন হই যেখানে মানব সমাজকে ধবংস করার জন্যই যেন চলেছে এক সর্বাত্মক প্রয়াস, বৈসাদৃশ্য ও বিচ্ছিন্নতার লীলা, আজ এই অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর সকলেই লাভ করেছেন— যেখানে ক্ষুদ্র স্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ ছোট ছোট গোষ্ঠী বর্তমান, সেখানে পারস্পরিক বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। এই ধরনের বিবাদ চলতে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই মানব ঐক্য ও সার্বিক কল্যাণ সাধন অসম্ভব।

—শ্রীগুরুজী

ভারতকে কিনে ফেলা হয়েছে

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করেই। ব্যতিক্রমী রাষ্ট্র ভারত। এদেশের রাষ্ট্রনায়কগণ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিক তথা হিন্দুদের জন্য ভাবিত নন। তাদের যত চিন্তা, যত ভাবনা সংখ্যালঘুদের জন্য। বলা ভাল মুসলমানদের জন্য। এদেশের মুসলমানরা অনুন্নত, অনগ্রসর, অবহেলিত, শিক্ষার আলোক বর্জিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত এবং আরও অনেক কিছু। তাই তাদের দারিদ্র্য মোচনে, অনগ্রসরতা রোধ করতে, উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে সংবিধান সংশোধন করা হয়, মুসলিম পার্সোনাল ল চালু করা হয়, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি মুলতুবি রাখা হয়, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা অব্যাহত থাকে, সাচার কমিটি এবং রঙ্গনাথন মিশ্র কমিশনের সুপারিশগুলি কার্যকরী করার জন্য তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং আরও অনেক কিছু করা হয়। কিন্তু একজনকেও গলায় পরানো রয়েছে সুদৃশ্য বক্‌লস। হ্যাঁ, আরবীয় ডলারের বক্‌লস। তাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার, কোনও কথা বলার অধিকার এরা হারিয়েছেন। পক্ষান্তরে মুসলমানদের সবরকম অন্যায় দেশবিরোধী কাজকর্ম আড়াল করার দায়িত্ব এরা কাঁধে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বৈঠকে (১১.৭.০৬) অর্জুন সিং এবং এ আর আন্তুলে দাবী করেন ১১ জুলাই ২০০৬ সালে মুম্বাইতে ৭টি রেলস্টেশনে যে পরপর বিস্ফোরণ ঘটে ছিল তাতে মুসলমানরা আদপেই জড়িত ছিল না বরং ওটা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের অপচেষ্টা। তাঁরাই একমাত্র বলেন, নাগপুরে আর এস এস-এর সদর দপ্তর-এ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যারা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল তারা আর. এস. এস-এর প্ল্যান অনুযায়ী ওই কাজ করতে গিয়েছিল। সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য বিমান বসু প্রকাশ্যে ইঙ্গিত দেন যে মুম্বাই বিস্ফোরণের ঘটনার

(৪.১১.০৬, দৈনিক স্টেটসম্যান)

(৩) সংখ্যালঘুদের জন্য তিন কেন্দ্রীয় প্রকল্প ইন্দিরা আবাস যোজনা, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার যোজনা এবং স্বর্ণজয়ন্তী গ্রাম স্ব-রোজগার যোজনা— এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ভবিষ্যতে ১৫ শতাংশ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণ থাকবে।

(বর্তমান, ২৭.১২.০৬)

(৪) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী এ আর আন্তুলে ঘোষণা করেছেন— অনুন্নত মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সাচার কমিটি যা সুপারিশ করেছে সেগুলি কার্যকরী করতে সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

(দ্য স্টেটসম্যান, ১৮.১২.০৬)

শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃত্ব নয়, বামদলগুলিও মুসলিম তোষণে অতীব ব্যগ্র। অথচ প্রায় প্রতিটি জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী জাতীয়তা-বিরোধী মুসলমানদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হয় এবং পরিশেষে পরিত্যক্ত হয়। জাতীয়তাবিরোধী

এই সমস্ত রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীরা নামে-পদবীতে, শিক্ষায়, আচার- আচরণে, পোষাকে হিন্দু হলেও সম্ভবত এদের অনেকেরই ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে মুসলমানের শোণিত। তাই মুসলমানদের প্রতি এদের এত অনুরাগ। মনে হয় নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরা নিজেদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীদেরও মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধিই এদের কাছে প্রধান। দেশমাতৃকা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ এদের নেই।

বলতে শোনা যায় না মুসলমানদের দারিদ্র্য অশিক্ষা কুসংস্কার প্রভৃতির জন্য দায়ী কে বা কারা? সেগুলি দূর করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না কেন? তাদের বেআইনি আবদার মেনে নেওয়া হচ্ছে কেন? তাদের ইচ্ছা অনুসারে সরকার চলছে কেন? হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের রায় তারা তুচ্ছজ্ঞান করে, দেশের সংবিধান তারা মানে না। কিন্তু কেন? এত স্পর্ধা তাদের হয় কি করে? ১৯৮৭ সালের ৩০ মার্চ দিল্লীর বোট ক্লাবে জামা মসজিদের ইমাম সৈয়দ আবদুল্লা বোখারী যখন বললেন: এই সরকার আমরা মানি না, এদেশের বিচার ব্যবস্থা আইন কানুন কিছু মানি না। পার্লামেন্টে আগুন লাগিয়ে দেব। রাজীব গান্ধী তোমার ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব...এসব কথা উচ্চারণ করার সাহস এদের হয় কি করে?

পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রয়াত জিয়াউল হক একবার বলেছিলেন For Pakistan India can never be a winnable proposition. We should never try that, but certainly it is a buyable product lets buy it... অর্থাৎ পাকিস্তানের পক্ষে ভারতকে জয় করা সম্ভবপর নয়। আমাদের সে চেষ্টা না করাই উচিৎ। তবে ভারতকে কিনে ফেলা যেতে পারে। সেটাই করা যাক। আজ জিয়াউল হক জীবিত থাকলে দেখে খুবই আনন্দ পেতেন যে তাঁর তত্ত্বকে মূলধন করে ভারতকে কিভাবে কিনে ফেলা হচ্ছে। দেশের তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতাদের অধিকাংশরেই পেছনে বিজেপি, শিবসেনার মত হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দলগুলির কোনও চক্রান্ত কাজ করে থাকতে পারে (২০.০৭.০৬, বর্তমান)। অথচ গোয়েন্দা তদন্তে প্রকাশিত হলো সকলেই মুসলমান এবং পাকিস্তানী সন্ত্রাসবাদী। তারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে ঢুকেছিল এবং বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছে। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুলায়ম সিং যাদব বললেন— সিমি আদৌ কোনও জঙ্গী সংগঠন নয়, একটি সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান। অথচ তদন্তে প্রকাশ পেল সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে সিমির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রয়েছে।

যারা দেশের হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টকে অগ্রাহ্য করে, দেশের সংবিধানকে তুচ্ছজ্ঞান করে তাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার কয়েকটি উদাহরণ—

(১) প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেন, দেশের সম্পদের ওপরও সংখ্যালঘুদের প্রধান অধিকার।

(২) মনমোহনের পনেরো দফা নির্দেশ—রাজ্য পুলিশে বাড়াতে হবে সংখ্যা। রেল, রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানেও চাকরীর ব্যাপারে বাড়তি নজর দিতে হবে। সংখ্যালঘুদের সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং নামী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতেও বিশেষ নজর দিতে হবে সংখ্যালঘুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে...ইত্যাদি।

মুসলমানদের বিরোধিতার কারণে লোকসভার অধিবেশনে বন্দেমাতরম সঙ্গীতটি সম্পূর্ণরূপে গাওয়া হয় না। এতে নাকি পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে। "জনগণ মন..." জাতীয় সঙ্গীতটিও নাকি মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে, তাই এটিরও অঙ্গচ্ছেদ করা হলো। বাধা এল কোথা থেকে? মুসলিম লীগের মহামান্য সাংসদ সুলেমান সঈদ, জনতা দলের প্রাক্তন সাংসদ সৈয়দ সাহাবুদ্দিন, মাওলানা ওবেদুল্লা খান আজমিসহ আরও কিছু ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ মহান ব্যক্তি! আসলে একজন সাচ্চা মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদী হওয়া সম্ভব নয়। কারণ হজরত মহম্মদের অনুগামীদের নিজের দেশ নয়, হজরত মহম্মদের দেশ অর্থাৎ আরবকেই স্বদেশ মনে করতে হবে, নিজেদের সংস্কৃতি নয় আরবের সংস্কৃতিকেই নিজেদের সংস্কৃতি হিসেবে স্বীকার করে নিতে হবে। এতসব ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও জাতীয়তাবিরোধী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এবং বুদ্ধিজীবীদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কোনও খামতি নেই। এই সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বুদ্ধিজীবীদের কাছে বিজেপি সাম্প্রদায়িক দল হলেও মুসলিম লীগ, অসম ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, সিমি, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন প্রভৃতি মুসলিম সংগঠনগুলি প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ। তাই এদের সঙ্গে জোট

(এরপর ৪ পাতায়)

বিদ্বেষমূলক তদন্ত

(১ পাতার পর)

ইন্দ্রেশকুমারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই অথচ তাঁকে অভিযুক্ত বানানো হয়েছে। বিগত কয়েক মাসে তদন্তের সময় তদন্তকারী অফিসাররা তাঁর সঙ্গে একবারও কথা বলেননি। কোনও একটি বৈঠকের নাম করে— যে বৈঠকের কথা ইন্দ্রেশজী আদৌ জানেন না— তাঁর নাম জুড়ে দিয়ে ইন্দ্রেশজীর এবং সঙ্ঘের বিশ্বাসযোগ্যতাকে বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। প্রকৃত ঘটনা কি তা না দেখেই অনেক রাজনৈতিক নেতারা অনর্থক বিবৃতির ফুলঝুরি ছড়ানো শুরু করে দিয়েছেন। প্রচারমাধ্যমের একাংশও যেন-তেন-প্রকারেণ ইন্দ্রেশজীকে অভিযুক্ত হিসেবে দেখিয়ে সঙ্ঘের উপর একরকম আক্রমণ করার চেষ্টা করছেন।

এখন আমাদের কাছেও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আমাদের ধারণার বিপরীতে আজমীর এবং হায়দরাবাদ বিস্ফোরণের তদন্ত নিরপেক্ষতার বদলে রাজনৈতিক এবং বিদ্বেষমূলক তদন্তে পরিণত হয়েছে। ওখানে সঙ্ঘকে বদনাম করার ষড়যন্ত্র পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আমি সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশের সংবিধানের প্রতি দায়বদ্ধ এবং আইন-কানুনের প্রতি বিশ্বস্ত একটি সংগঠন। কোনও বিদ্বেষকারী বা কুটিল রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কাছে কোনওভাবেই তা মাথা নত করবে না। এখন আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সঙ্ঘ বিচারালয় সহ সকল পথেই তদন্তকর্তা এবং তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের অসাধু ইচ্ছাকে চ্যালেঞ্জ জানাবে। আমাদের লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক এবং হিতৈষীদেরকে একথা জানানো আমার কর্তব্য যে, তাঁরা যেন মনে রাখেন— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এক সংগঠিত শক্তিশালী এবং অনুশাসনবদ্ধ দেশভক্ত সমাজ নির্মাণের নিজ লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে। যতই বিরোধিতা আসুক না কেন আমরা দেশবাসীদের ভালোবাসা, বিশ্বাস এবং সমর্থনের ফলে স্বীয় লক্ষ্যপ্রাপ্তির পথে এগিয়ে যাবই।"

হামলার মুখে জাতীয়তাবাদী ছাত্র-যুবরা

(১ পাতার পর)

কাশ্মীরের স্বাধীনতার সমর্থনে এতগুলো কথা বললেন, অথচ কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার কাণ্ডারী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নাম একবারও মুখে আনলেন না কেন?' এরপরেই আচমকা মারমুখী হয়ে অরুণ সাউয়ের দিকে তেড়ে আসে উপস্থিত মাওবাদী ছাত্র-নেতারা। এদের মধ্যে সদ্য জামিনে ছাড়া পাওয়া অভিযুক্ত মাওবাদী নেত্রী দেবলীনা চক্রবর্তীও ছিল। এরা লোহার রড ও লাঠি নিয়ে অরুণবাবুকে মারতে উদ্যত হয়। পরিস্থিতি ঘোরালো হচ্ছে দেখে সভায় উপস্থিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ এবং ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার কর্মী ও সমর্থকরা আক্রান্ত অরুণ সাউ-কে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন। মাওবাদী ছাত্র-ছাত্রীরা চড়াও হয় তাঁদের ওপরেও। বিদ্যার্থী পরিষদের নীরজ কুমার ও যুব মোর্চার যাগ্নিক আগরওয়াল গুরুতর আহত হন। এদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে নীরজের মাথায় স্টিচ করে কিছুক্ষণ পর ছেড়ে দেওয়া হয় এবং আঘাত গুরুতর বলে কয়েকদিনের জন্য যাগ্নিককে সেখানে ভর্তি করে নেওয়া হয়। এছাড়াও যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি অমিতাভ রায়, বিদ্যার্থী পরিষদের কলকাতা শাখার সম্পাদক লোকনাথ চ্যাটার্জী সহ তনুশ্রী রায়, গৌতম চৌধুরী ও অন্যান্যরাও কম-বেশী আঘাত পান। ঘটনার সময় পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়।

এই আক্রমণের পর এ বি ভি পি ও যুব-মোর্চার কর্মী-সমর্থকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে এক ঘণ্টা ধরে পথ-অবরোধ করেন। অবরোধের কারণ জেনে পথচারীরা তা সক্রিয় সমর্থন করায় অবরোধকারীদের কাজটা সহজই হয়। এদিকে পুনরায় সভা চালানোর চেষ্টা করলে এবার সভাগৃহের মধ্যে পরিষদের কলকাতা মহানগরের সহ-সভাপতি পীতারুণ মুখোপাধ্যায় সহ কয়েকজন কার্যকর্তা ফের প্রতিবাদ জানালে আলোচনা-চক্রটি পুরোপুরি ভেস্তে দিতে বাধ্য হয় আয়োজকরা। পরে পরিষদের রাজ্য সভাপতি রবিরঞ্জন সেনের উপস্থিতিতে যাদবপুর থানায় গিলানী সহ 'আজাদী' আলোচনা-চক্রের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করা হয়।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ইউ এস ডি এফ সরাসরি তাদের নামে 'আলোচনাচক্র'টি বিবেকানন্দ হলে করার অনুমতি চায়নি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, চেয়েছিল ভিন্ন নামে। দ্বিতীয়ত, এর বিষয়বস্তু কিংবা বক্তাদের নামও জানানো হয়নি তাদের। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেন যে যুবমোর্চা ও বিদ্যার্থী পরিষদের আন্দোলনের চাপেই ভবিষ্যতে এ নিয়ে আরও কড়া অবস্থান নিতে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদেশী পর্যটকের মুখোশে

(১ পাতার পর)

মিসেস জয়সি মেয়ার (আমেরিকা), ডেভিড মেয়ার (ইউ এস এ), টমি বারনেট (আমেরিকা), দিনো রিজ্জো (আমেরিকা), মিস্ ডারলিন স্কেচ (অস্ট্রেলিয়া)। এছাড়াও তাদের দলের সঙ্গে ছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে আগত 'হিল সঙ্ ওয়ারশিপ ব্যাণ্ড'-এর দল। সকলের ছিল ট্যুরিস্ট ভিসা। ভারতীয় আইন অনুসারে ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে এধরনের ধর্মীয় প্রচারের অনুষ্ঠানে কেউ যোগ দিতে পারেন না। ধর্মান্তরকরণের উদ্দেশ্যে আসা এইসব বিদেশীদের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদনে প্রশাসন কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত না করাতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতৃত্বে চার্চের (জোড়া গীর্জা) সামনে গত ২০ অক্টোবর বিক্ষোভ প্রদর্শন ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলে যুবকরা গেরুয়া পতাকা নিয়ে সামিল হন। ওই মিছিলের পর প্রশাসন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি গ্রহণ করে। যদিও এই জলসা বেশকিছু প্রশ্নও ছুঁড়ে দিল রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দিকে। ভারতের ভিসা আইন অনুযায়ী দেশে আসা কোনো বিদেশীই আমাদের দেশের মাটিতে কোনও জনসমাবেশে ভাষণ বা প্রবচন করতে পারবে না। ধর্ম প্রচারের জন্য যে বিশেষ ভিসা কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় (মিশনারী ভিসা), তা ১৯৬০-৬১ সালের পর আর দেওয়া হয়নি। সুতরাং এর উত্তর কেন্দ্র সরকারকে দিতে হবে যে শ্রীমতী মেয়ার আর তার দলবলের এই জলসার কার্যক্রম দেশের কোন আইনের আওতায় স্বীকার করা হলো?

সঙ্ঘের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

(১ পাতার পর)

লক্ষ্ণৌ বেঞ্চে র রায়ের পর সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, 'এই রায় 'কারও জয় আর অন্যের পরাজয়'—এভাবে দেখা ঠিক নয়। 'রাম' সবার জন্য আদর্শ। এদেশের সবার পূর্বপুরুষ। এজন্য অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে সুন্দর রামমন্দির নির্মাণে সকলেরই সহযোগিতা করা উচিৎ। এর ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ্যের পরিবেশ নির্মাণের পথ সুগম হচ্ছিল। প্রকৃত ধার্মিক মুসলমানরাও রায় মেনে মন্দিরের পক্ষে, সে সময় মুসলমানদের থেকে সঙ্ঘকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা হচ্ছে। ইন্দ্রেশকুমারকে টার্গেট করা হয়েছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মদনদাসজী বলেন, ইন্দ্রেশজী বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। এছাড়া তিনি 'হিমালয় পরিবার'-এর মাধ্যমে বৌদ্ধ দেরও মূল স্রোতে ফেরানোর কাজ করেছেন। সেজন্যই তাঁকে টার্গেট করা হয়েছে। ইন্দ্রেশজীকে আজ অবধি কেউ কোনও জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেনি। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমদনদাসজী জানান, সঙ্ঘ আইনী পথেও অন্যায়ের মোকাবিলা করবে।

সঙ্ঘকে আবার নিষিদ্ধ করার বিষয়ে শ্রীমদনদাস বলেন, যতবার সঙ্ঘকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে ততবারই সঙ্ঘ সব বাধা কাটিয়ে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে, ১৯৪৮, ১৯৭৫ এবং ১৯৯২-এ নিষিদ্ধ করার পর।

এদিন একান্ত সাক্ষাৎকারে শ্রীমদনদাসজী বলেন, সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের কারণে এদেশে জনজাতিদের ধর্মান্তরকরণ বাধাপ্রাপ্ত। রামসেতু ধ্বংস করা যায়নি, জম্মু-কাশ্মীরে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি ফেরৎ দিতে হয়েছে। এসব কারণে সঙ্ঘকে বদনাম করার জন্য আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থাকতে পারে। এদিন তিনি কড়া ভাষায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর 'স্যাফ্রন টেরর' এবং রাহুলের 'সিমি ও আর এস এস সমান'— মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে মদনদাসজীর সঙ্গে সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। মদনদাসজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন আর এস এসের প্রান্ত কার্যবাহ তিলক রঞ্জন বেরা।

ভারতকে কিনে ফেলা হয়েছে

(৩ পাতার পর)

করে ঘোঁট পাকাতে অর্থাৎ রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ক্ষমতা দখল করতে এরা এতটুকু বিবেকের দংশন অনুভব করে না। মনে হয় না কি এইসব রাজনীতিক আর বুদ্ধি জীবীরা মুসলিম ভোট আর আরবীয় নোটের কাছে নিজেদের বিবেক বন্ধক রেখেছে? নির্লজ্জ স্তাবকতা ছাড়া একে আর কি বলা যেতে পারে জানা নেই। আরও একটা কারণ থাকা অসম্ভব কিছু নয়। এই সমস্ত রাজনীতিক আর বুদ্ধিজীবীরা নামে-পদবীতে, শিক্ষায়, আচার-আচরণে, পোষাকে হিন্দু হলেও সম্ভবত এদের অনেকেরই ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে মুসলমানের শোণিত। তাই মুসলমানদের প্রতি এদের এত অনুরাগ। মনে হয় নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এরা নিজেদের স্ত্রী কন্যা ভগিনীদেরও মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করবে না। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধি ই এদের কাছে প্রধান। দেশমাতৃকা নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ এদের নেই। সাচার কমিটি রিপোর্টের পর মুসলিম তোষণের আর একটি মোক্ষম অস্ত্র রঙ্গনাথন মিশ্র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের দাবীতে সোচ্চার হয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে ১৫ শতাংশ পদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের কথা বলছে। আবার পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার রাজ্য সরকারের চাকরিতে মুসলমানদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের কথা ঘোষণা করেছে। আবার অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্ট মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের বিষয়টি খারিজ করে দিয়েছে। কারণ হিসেবে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ধর্মান্তরকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি র উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার ধর্মনিরপেক্ষ। তাহলে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সুপারিশ এরা মেনে নিচ্ছেন কোন্ যুক্তিতে? যুক্তিটুক্তি নয়, গরজ বড় বালাই। মুসলমানরা দরিদ্র, মুসলমানরা অনুন্নত। হিন্দুদের মধ্যে কি দরিদ্র নেই? হিন্দুদের মধ্যে সবাই উন্নত? এদেশে অতি দরিদ্র মুসলমানের সংখ্যা ৫ কোটি হলে অতি দরিদ্র হিন্দুর সংখ্যা অন্ততঃ ২৩ কোটি। হিন্দুদের মধ্যে হাড়ি, বাগদি, ডোম কলু, বারুই, মণ্ডল, দাস এরা সবাই উন্নত! আর মুসলমানদের জন্য যে সংরক্ষণের ব্যবস্থা তার হিসেবটা কি রকম? যে সব মুসলমানের মাসিক আয় ৩৭,৪৯৯ টাকা মাত্র তারা কর্মক্ষেত্রে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের সুবিধা পাবেন! অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে তেলা মাথায় তেল ঢালার ব্যবস্থা হলো। দরিদ্র অনুন্নত মুসলমানরা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই পড়ে রইল। মধ্যবিত্ত মুসলিমদের সবাইকেই এই সংরক্ষণের আওতায় আনা হলো। ফলে যোগ্য প্রার্থীরা চাকরি পাবে না, অযোগ্য প্রার্থীরা সংরক্ষণের সুযোগে সরকারি পদ অধিকার করবে। ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ যোগ্য প্রার্থীদের বঞ্চি ত করে সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে অযোগ্য প্রার্থীরা ডাক্তারী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়ার সুযোগ পাবে। ফলে দেশে তৈরী হবে নিম্নমানের ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ম্যানেজার প্রভৃতি। দেশের অগ্রগতি? কার সাধ্য রোধে তার গতি?

রাজ্য রাজনীতি

এ রাজ্যের সামনে গভীর সঙ্কট

নিশাকর সোম

রাজ্যের সিপিএম-নেতৃত্ব রাজনৈতিক বক্তব্যে দেউলিয়া হয়ে বিভিন্ন জনসভায় বিরোধী নেত্রীর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং কুৎসিৎ শব্দ-প্রয়োগ করে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। সিপিএম-এর এই নীতির দরুণ লালগড়ে সিপিএম-এর সক্রিয় কর্মীরা নিস্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা নাকি তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। এ কথা আগেই এই কলমে লেখা হয়েছিল, যে ম্যাসলম্যানদের সাহায্যে নির্বাচনকে "ওয়ান ডে ম্যাচ"-এ পরিণত করছিলেন সিপিএম নেতৃত্ব, সেই ম্যাসলম্যানরা এখন বর্ধিষ্ণু ক্ষমতার দিকেই ঝুঁকে যাবে—এটা বলাই বাহুল্য।

তবে সিপিএম-নেতৃত্ব এইরকম হিংসাশ্রয়ী বক্তব্য রাখছেন কেন? কারণ হলো— প্রথমত এই বক্তৃতা করে নিজেদের কর্মীদের উত্তেজিত করে নিচের তলায় বিরোধীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া। ফলে কর্মীদের বিরোধী-শিবিরে যাওয়া বন্ধ হবে। দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষকে ত্রাসে রাখা। তৃতীয়ত, শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভোটদান থেকে বিরত করা।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো কেরলে সিপিএম-এর পঞ্চায়েত-নির্বাচনে বিপর্যয়ের ফলে কেরলে নেতাদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব, এ-রাজ্যের সিপিএম-কর্মীদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টির আরও একটা কারণ হিসাবে দেখা দিচ্ছে।

তদুপরি সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতাদের বক্তব্যও পার্টিকর্মীদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। যেমন সিপিএম-এর পলিটব্যুরো সদস্য ডঃ পান্ধে বলেছেন, সিপিএম-এর ঘুরে দাঁড়ানো এখনই সম্ভব হবে না। উল্লেখ্য ডঃ পান্ধে পশ্চিবঙ্গ রাজ্য সিপিএম-এর এবং সরকারের নীতির তীব্র সমালোচক।

সিপিএম-এর সাধারণ-সম্পাদক প্রকাশ কারাতের লন্ডন-এর বক্তৃতা নিয়ে সমালোচনা এবং পরে কারাতের সংশোধনী নিয়ে সিপিআই-সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে। এই বাদানুবাদে সিপিআই-এর সাধারণ-সম্পাদক এ বি বর্ধন জানিয়েছেন, তিনি ১৯৪০ সাল থেকে পার্টি সদস্য। প্রসঙ্গত, সিপিএম-এর সাধারণ-সম্পাদক একেবারে নবীন সদস্য— রাজনীতির পাঠ ব্যতিরেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তি।

সিপিএম-এর রাজ্য-সম্পাদক বিমান বসু বিভিন্ন বক্তৃতায় নিচের তলার কর্মীদের সমালোচনা করে চলেছেন। এদিকে রাজ্যের উপর তলার সিপিএম নেতাদের সম্বন্ধে নিচের তলার কর্মীদের আস্থাহীনতা দেখা যাচ্ছে।

সিপিএম পার্টির হোলটাইমারদের "ওয়েজ" বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন মাসিক চার হাজার টাকার স্থলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের সমান "ওয়েজ" দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। সিপিএম-এর রাজনীতি নিজেদের আখের গুছিয়ে রাজার হালে থাকার ব্যবস্থা করেছে। নেতা-মন্ত্রীরা আত্মীয়স্বজনকে চাক্‌রি দিয়ে, শেয়ার মার্কেট-এর কামানেওয়ালা করে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। এই নেতারা জানেন যে সরকার থেকে চলে গেলেও তাঁরা বেশ সুখেই থাকবেন। মার খাবেন নিচের তলার কর্মীরা। ১৯৭১-৭২-এ তাই হয়েছিল।

একটা উদাহরণ— যখন বেলগাছিয়া থেকে সিপিএম-এর কর্মীরা উৎখাত হচ্ছেন তখন প্রয়াত নেতা লক্ষ্মী সেন কংগ্রেস নেতা নন্দ ব্যানার্জির সঙ্গে যৌথ পদযাত্রা করেছিলেন। সেই সময়েই যখন পুলিশ সিপিএম-এর নিচের তলার কর্মীদের উপর আক্রমণ করছে। ঠিক সেই সময়ে উত্তর কলকাতা পুলিশের ডি. সি. বিভূতি চক্রবর্তী লক্ষ্মী সেনের পুত্র-কে নিরাপদে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী অবস্থায় আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ার কর্মসূচী রাজ্য সিপিএম-নেতৃত্ব নিয়ে ফেলেছে। আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন গড়ার নির্দেশ জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী অবস্থায় আন্দোলন এবং সংগঠন গড়ার কর্মসূচী রাজ্য সিপিএম-নেতৃত্ব নিয়ে ফেলেছে। আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠন গড়ার নির্দেশ জেলাগুলিতে পাঠানো হয়েছে।

অন্যদিকে সিপিএম-বিরোধীদল তৃণমূল আগামী নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে সভা-সমাবেশ-সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে। নেত্রীর নির্দেশে রাজ্য থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহারের সপক্ষে গণস্বাক্ষর অভিযানের নির্দেশ দিয়ে বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রকাশ্য বিরোধিতায় গেছেন। মমতা ব্যানার্জি-র সঙ্গে রেলের বোনাস নিয়ে প্রণব মুখার্জির বিতর্কের পর শ্রীমুখার্জির ডাকা জমি অধিগ্রহণের সভা মমতা ব্যানার্জি বয়কট করেছেন।

তৃণমূলের মধ্যে ধৈর্যচ্যুতির লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। তৃণমূলের নিচের তলার কর্মীরাও "বদলা" নেবার জন্য নাকি প্রস্তুত হচ্ছেন। আগামী দিনে রাজ্যে শান্তির পক্ষের শক্তিধরদের অগ্রণী ভূমিকাটাই হবে সাধারণের মরুদ্যান।

অন্যরকম

মধ্যপ্রদেশের ডোমনিয়া ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মধ্যপ্রদেশের বড়বানী জেলার একটি অখ্যাত গ্রাম। নাম সালীটান্ডা। তবে এখন আর অখ্যাত নয়। ইদানীং গ্রামটির মাথা থেকে 'অখ্যাত' বদনামটি মুছে গেছে। মধ্যপ্রদেশের বনবাসীদের চোখে গ্রামটি এখন একটি পবিত্র স্থান। সালীটান্ডার নামেই শ্রদ্ধায় নুইয়ে যায় তাদের মাথা। কপালে ঠেকে হাত। কারণ এখানেই জন্মেছেন মধ্যপ্রদেশের জীবন্ত ভগবান শ্রী ডোমনিয়া ভাই।

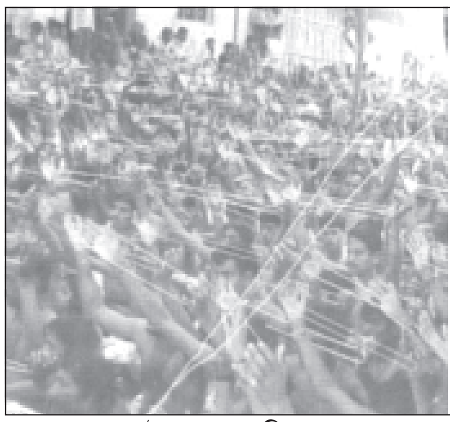

শ্রদ্ধায় উদ্বেল জনজাতিরা।

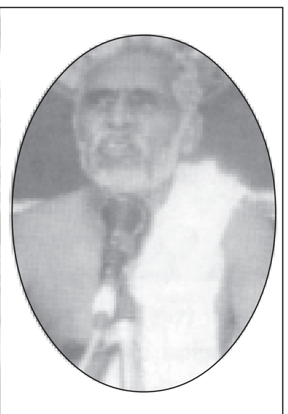

ডোমনিয়া ভাই

চেহারায় নেই কোনও দেবসুলভ ভাব। নেই কোনও রূপের ঘনঘটাও। তবুও এই সাধারণ চেহারার মানুষটি আজ কতটা অসাধারণ, সেটা ইতিমধ্যেই বেশ প্রমাণিত। মধ্যপ্রদেশের বনবাসী অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবনে একটা নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছেন তিনি। আমূল পরিবর্তন এনেছেন তাদের দৈনন্দিন জীবনেও।

প্রতিবছর মধ্যপ্রদেশের খরগোন-ঝাবুয়া এলাকার অন্তর্গত বনবাসী অঞ্চলে ঋষিপঞ্চমীর দিন বনবাসীদের একটি বিশাল কার্যক্রম আয়োজিত হয়। ব্যতিক্রম হয়নি এ বছরেও। কার্যক্রমটি এবছর আয়োজন করা হয় মধ্যপ্রদেশের লফগাঁওতে। কাতারে কাতারে বনবাসীরা উপস্থিত ছিলেন, এই উপলক্ষে। প্রসঙ্গত, ডোমনিয়া ভাই গায়ত্রী পরিবারের সঙ্গে যুক্ত।

ঋষিপঞ্চমীর পবিত্র দিনে উপস্থিত শ্রী ডোমনিয়া ভাই ওইদিন বলেন, "আমাদের মধ্যে নিষ্কাম ভক্তি, সেবা শ্রম ও সততার মতো অলংকার আছে, যা আজকের যুগে মানুষের মধ্যে দুর্লভ।"

শুধু মধ্যপ্রদেশের গ্রামগুলিই নয়, শ্রী ডোমনিয়া ভাইয়ের আহ্বানে ওইদিন সাড়া দিয়েছিলেন গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও ছত্তিশগড়ের বনবাসী অঞ্চলের জনজাতিরাও। হাজার হাজার বনবাসী এই উপলক্ষে ঋষি পরম্পরা ও বৈদিক সংস্কারের আচরণ বিধি পালন করার ব্রত নেন। নিজেদের জীবনে আনতে চান এক আমূল পরিবর্তন। তবে এই সবকিছুর মূলেই রয়েছেন ডোমনিয়া ভাই। ঋষি পরম্পরা ও বৈদিক সংস্কৃতিক সংস্কারে সংস্কারিত করছেন অসংখ্য বনবাসীর জীবন।

গত ৩০ বছর ধরেই বনবাসীদের কল্যাণে তিনি এই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের সেবাতে নিবেদিত করেছেন নিজেকে। অসংখ্য মানুষ শ্রী ডোমনিয়া ভাইয়ের কল্যাণে মদ, তামাক সহ বিভিন্ন নেশাদ্রব্যকে নিজেদের জীবন থেকে বর্জিত করে পেয়েছেন এক নতুন আলোর সন্ধান।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল ডঃ ভাই মহাবীর শ্রী ডোমনিয়া ভাইকে তার এই কর্মকাণ্ডের জন্য সম্মানিতও করেন।

ঈশ্বর নয়, মানব সেবাকেই ঈশ্বর সেবা মানেন তিনি। তাইতো আজ মধ্যপ্রদেশের গন্ডি ছাড়িয়ে তার খ্যাতি বাইরের মানুষের কাছেও ছড়িয়ে পড়েছে। মানবধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম মনে করেন তিনি। বনবাসীদের কাছে তিনি ভগবানের দূত। সাধারণ মানুষের থেকে তিনি একটু 'অন্যরকম'।

কাশ্মীরের বেলায় একরকম, হিন্দুদের বেলায় অন্যরকম কেন?

মুজফ্‌ফর হোসেন

উত্তরপ্রদেশের ইসলামি পণ্ডিত মহম্মদ হাসমি মিঞা একবার ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন— 'সারা উলুম বন্দ্ হ্যায়, মগর ফতোয়া কী খুলী ছুট…!' কথাটা দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসা সম্বন্ধে সঠিকভাবে প্রযোজ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। পড়াশোনা নয়, সারা ভারতের মুসলমানদের ঠ্যাকা নিয়ে যেন বসে আছে ওই মাদ্রাসা। মুসলমানদের শিক্ষাগত উন্নয়ন নয়, তাদের নিয়ে রাজনীতি করাই মুখ্য। মাঝে মাঝেই বিবৃতি দিয়ে মনে করিয়ে দেওয়া হয়, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদেরও অবদান ছিল। এর একমাত্র কারণ— দেওবন্দ মাদ্রাসা স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতের মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেজন্য ভারতবর্ষের যে কোনও বিষয়ে বক্তব্য দেওয়ার এবং সরকার ও হিন্দুসমাজকে দাবড়ানি দেওয়ার এক্তিয়ার তাদের রয়েছে। 'ফতোয়া' শব্দটা মনে এলেই 'দেওবন্দ'-এর কথা মনে পড়ে যায়। ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়— বরেলী ও দেওবন্দী (ওই স্থানের মাদ্রাসার অনুসারী)। বরেলী অনুসারী বা বরেলবী মুসলমানদের সংখ্যাটা ৩৮ শতাংশ এবং দেওবন্দী বা 'দেওবন্দ' অনুগামী মুসলিম মাত্র ২৮ শতাংশ বলে গ্রাহ্য।

এবছর দেওবন্দীরা 'কাশ্মীর' নিয়ে একটি সম্মেলন করেছিল। সেখানে এগারো দফা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ওই প্রস্তাবে জম্মু-কাশ্মীরের প্রতি সবরকম সহানুভূতি ব্যক্ত করার সঙ্গে তাদেরকে ভারতবর্ষের সঙ্গেই ভবিষ্যৎ সঁপে দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়েছে।

হিন্দুদের জন্য কোনও মাথাব্যথা নেই

ওই সম্মেলনের শেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে দেওবন্দের এক প্রতিনিধিদল কাশ্মীরি উপত্যকার নাগরিকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তা বলতে যাবেন। কেননা, কাশ্মীরী মুসলমানদের বাকী ভারতের সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ রয়েছে। কথা হলো, আজ পর্যন্ত জম্মু-কাশ্মীরের হিন্দুদের বিষয়ে দেওবন্দ কোনওরকম উচ্চবাচ্য করেনি কেন? ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজই মুসলমানদের ব্যাপারে সবরকম চিন্তা-ভাবনা করেন। তাহলে কাশ্মীর উপত্যকার যে হিন্দুরা বিতাড়িত হয়ে রাস্তায় রাস্তায় উদ্বাস্তুর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন তাদের বিষয়ে কাশ্মীরের মুসলমানরা সহানুভূতিসুলভ কোনও কথা বলেননি। কেন? কাশ্মীরের বিষয়ে দেওবন্দের যত চিন্তা-ভাবনা তা শুধু সেখানকার মুসলমানদের জন্যই, হিন্দুদের জন্য নয়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, যখন দেওবন্দ ভারতের সংখ্যালঘুদের বিষয়ে তৎপর তখন জম্মু-কাশ্মীরের সংখ্যালঘু হিন্দুদের বিষয়ে নীরব কেন? এর একটাই সোজা সরল উত্তর হলো, দেওবন্দ-এর মাথাব্যথা শুধুই মুসলমানদের নিয়ে। হিন্দুদের জন্য নয়।

উপত্যকায় নিজেদের বাসভূমিতে ফেরার দাবীতে শরণার্থী কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মিছিল।

কয়েক দফা প্রস্তাবের মধ্যে ৩৭০ ধারা হঠাবার কোনও কথাই নেই। কাশ্মীরের মুসলিমদের সমর্থক দেওবন্দীরা কাশ্মীরী মুসলমানদের বেকারত্বের জন্য চোখের জল ধরে রাখতে পারছে না। তাহলে ৩৭০ ধারা বাতিল করে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের ব্যবসায়ীদের, শিল্পপতিদের সেখানে ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন না কেন? তাহলে তো বেকারী-বেরোজগারী সমস্যাই দূর হয়ে যাবে। দেওবন্দের মাতব্বররা ওই সম্মেলনে 'মুসলিম সন্ত্রাস' নিয়ে আলোচনাই করলেন না কেন? কেন তারা পাকিস্তানকে কড়া গলায় বলছেন না— 'কাশ্মীরে জঙ্গি অনুপ্রবেশ বন্ধ কর। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত'! এটা হলেই তো চিরদিনের জন্য কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা তুলতে পারবে না।

কট্টরপন্থী মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গত

দেওবন্দীরা কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে ভাষায় সমর্থন করছেন সেই একই ভাষায় কট্টরপন্থী মুসলমানদের সঙ্গে সায় দিয়ে শ্রীরাম জন্মভূমির বিষয়েও সমর্থন ব্যক্ত করছেন। দেওবন্দ তো একটি মুসলিম ধর্মীয় সংস্থা মাত্র। তাহলে যারা বাবরি কাঠামোর জন্য আদালতে যাচ্ছেন তাদেরকে বলছেন না কেন— এলাহাবাদ হাইকোর্টের লক্ষ্ণৌ বেঞ্চের রায় মেনে নিয়ে শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যের পরিবেশ তৈরি করতে সাহায্য করুন। যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মহলে দেওবন্দের প্রভাব কার্যকরী হয় তখন এই ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্য চেষ্টা করুন। সুন্নী ওয়াকফ্ বোর্ড এবং বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটিও তো ধর্মমতভিত্তিক সংগঠন। এজন্যই ধর্মমত সম্বন্ধিত বিষয়ে অধিকার এবং প্রভাবের অধিকারী দেওবন্দ মাদ্রাসা ওই কাজ অবশ্যই করতে পারে।

বাবরি কাঠামোর সম্পর্কে অনেকের এমনকী মুসলমানদের মধ্যেও সংশয় রয়েছে আদৌও ওটা মসজিদ ছিল কিনা! এমনও প্রশ্ন উঠেছে যে, দেওবন্দের মৌলানাদেরকে প্রথমেই স্থির করতে হবে ওই কাঠামোটাকে মসজিদ বলা উচিৎ কি? প্রত্নতাত্ত্বিক খনন করতে গিয়ে মন্দিরের অনেক প্রামাণ্য চিহ্নই দেখা গিয়েছে, মসজিদের নয়। এজন্য 'মসজিদ'-এর কথা যাঁরা বলছেন তারা কি একবারও ভেবে দেখছেন— আদৌ ওই কাঠামোকে 'মসজিদ' বলে স্বীকার করা যায় কিনা! 'মসজিদ' বিষয়ে শরিয়তে কিছু নিয়ম-কানুন আছে। এক্ষেত্রে সেই নিয়ম-কানুন মেনে চললে ধাঁচাটাকে 'মসজিদ' বলা কি সঙ্গত? অনেক ইসলামি পণ্ডিতদের মতে সেখানে এখন 'মসজিদ' বলে কোনও বস্তুই নেই, তাকে মসজিদ বলে জিদ করে লড়াই করার কোনও অর্থ হয় না। এটা ইসলামি নিময়মনীতির বিরোধী। এজন্য যেহেতু দেওবন্দ একটি ধর্মীয় মাদ্রাসা সেজন্য ওঁরা বলতেই পারেন— "যখন মসজিদের কোনও কিছুই নেই তখন মসজিদের নামে হিংসাচার, মানুষের রক্তে হাত লাল করা নিরর্থক, অনুচিত। মসজিদের জন্য জমি কিনতে হয়। যদি কেউ মসজিদের জন্য ভূমি দান করে সেক্ষেত্রেও দলিল-দস্তাবেজ থাকা বাঞ্ছনীয়। মসজিদ লুটের মাধ্যমে জবরদখল করা জায়গায় অথবা অনৈতিকভাবে কব্জা করা জায়গায় হতে পারে না। যারা 'বাবরি মসজিদ' 'বাবরি মসজিদ' বলে চিল-চীৎকার করছেন তারা কোনও প্রমাণই দিতে পারেননি যে কারা ওখানে মসজিদ তৈরি করেছিল, ওই 'স্থান' তারা কোথা থেকে পেয়েছেন কিংবা ওই স্থানের মালিকানা কার? অথচ ইতিহাসই সাক্ষ্য দিচ্ছে সারা অযোধ্যাই রাজা দশরথের রাজধানী ছিল। শুধু তাই নয়, সম্পূর্ণ অবধ-এর সঙ্গে রামচন্দ্রের নাম সংযুক্ত। এজন্য রামের জন্মভূমিতে মন্দিরের বিষয়ে কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাহলে বার বার রামের জন্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কেন?

মারাঠাদের বীরত্ব

১৭৫১ সালে অযোধ্যার দ্বিতীয় নবাব সফদরজঙ্গ গঙ্গা-যমুনার সংযোগস্থলে পাঠান আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য মারাঠা সৈন্যদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। মারাঠী সেনারা সেনাপতি মল্লার রাও হোলকরের নেতৃত্বে ওখানে পৌঁছে পাঠানদের পর্যুদস্ত করেছিল। এভাবে সফদরজঙ্গকে জিতিয়ে দিয়ে মারাঠা সৈন্যরা তাঁদের শৌর্য-বীর্যের পরাক্রম প্রদর্শন করেছিল সারা ভারতের সামনে। এই জয়ের প্রতিদান হিসেবে মারাঠারা দাবী করেছিল যে তাদেরকে 'পবিত্রস্থল' অযোধ্যা, কাশী এবং তীর্থরাজ প্রয়াগ (যা তাদেরই ছিল, রাজত্বের সীমান্তের সঙ্গে যুক্ত) প্রত্যর্পণ করা হোক। ১৭৫৬ খৃস্টাব্দে নবাব সুজাউদ্দৌলা আবারও পাঠান আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচার জন্য মারাঠাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। মারাঠা সেনারা আবারও পাঠানদেরকে পরাস্ত করে। মারাঠা সর্দাররা আরও একবার পুরনো 'দাবী' জানায়। যুদ্ধে সহায়তার পরিবর্তে হিন্দুদের তিনটি পবিত্র তীর্থস্থান—অযোধ্যা, কাশী ও প্রয়াগ প্রতিদান হিসেবে তাঁদেরকে প্রদান করা হোক। সুজাউদ্দৌলা এবারও সম্মতি দেন। কিন্তু মারাঠা সৈন্যরা পাঞ্জাব জয়ে অগ্রসর হয়। ফলস্বরূপ পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠারা ১৭৬১ সালে পরাজিত হয়। পাঞ্জাবের পথে এগিয়ে যাওয়ার আগেই মারাঠারা যদি ওই তিন তীর্থস্থান নিজেদের দখলে করে নিতেন তাহলে হয়তো বা আজকের পরিস্থিতির উদ্ভবই হোত না। বাবরি বাবরি জপ করা মুসলমান বন্ধুরা যদি একবার এই ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তাহলে ভবিষ্যতে তাদেরও লজ্জিত হতে হবে না।

সাম্প্রতিক পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মোদীর গুজরাটে মৃত্যুঘন্টা বেজে গেল কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'মওত কা সওদাগর' (মৃত্যুর ব্যবসায়ী)-র সাম্প্রতিক নির্বাচনী রণে তাঁর এহেন অভিধাকারীর দলের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে তা চরমতম দুঃস্বপ্নেও বোধহয় কল্পনা করতে পারেননি কোনও কংগ্রেস সমর্থক। ইতিপূর্বে সে রাজ্যের বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী নরেন্দ্র মোদীকে 'মৃত্যুর সদাগর' বলে জনসভাগুলোতে কটাক্ষ করতে শুরু করেছিলেন। এরপর মোদীকে ফাঁসানোর জন্য কত কাণ্ড। যার সর্বশেষ সংযোজন সোহরাবউদ্দিন এনকাউন্টার মামলায় মোদীকে না পারলেও মোদীর মন্ত্রিসভার সদস্য তথা গুজরাটের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অমিত শাহকে অন্ততঃপক্ষে ফাঁসানো হয়েছে। যদিও সে ফাঁস এখন প্রায় আলগা এবং যার দরুণ জামিনে শাহের মুক্তিপ্রাপ্তি। তিনি কত দ্রুত নির্দোষ প্রমাণিত হবেন এবং তার জন্য কংগ্রেসের বারোটা কিভাবে বাজবে— এ হেন প্রশ্নগুলো ভবিষ্যতের গর্ভে পাঠিয়ে দিলেও গুজরাটের সাধারণ মানুষ সাম্প্রতিক পুর এবং পঞ্চায়েত ভোটে কংগ্রেসের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছেন।

ভোটদাতাদের বৈসাদৃশ্য বেশ ভালভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল এবার গুজরাটের পুরসভা নির্বাচনে। এতে একদিকে যেমন শিল্পপ্রধান এলাকার মানুষজন ছিলেন, তেমনি গোধরা-পরবর্তী কাণ্ডে সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসা বেশ কিছু এলাকার নিম্নবিত্ত ও গরীব এমনকী হত-দরিদ্র মানুষও ছিলেন। ভোট-বিশ্লেষকরা বলছেন, সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই একইরকম আদরণীয় গুজরাটের মোদী সরকার। এতে স্থানীয় সমস্যাসমূহ যুক্ত হলেও মোদী-ক্যারিশ্মার কাছে হালে পানি পায়নি। তবে স্থানীয়ভাবেও বিজেপি-র গ্রহণযোগ্যতা, কংগ্রেসের তুলনায় অনেকটাই বেশি, এমনটা অভিমত বিশেষজ্ঞদের। যে কারণে গত ১২ অক্টোবর প্রকাশিত ৬টি পুরসভার ফলাফলের প্রত্যেকটাতেই আশাতীত সাফল্যলাভ করেছে বিজেপি। আমেদাবাদ, সুরাট, রাজকোট, ভদোদরা (বরোদা), ভাবনগর— এই ৫টি পুরসভাতেই দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে জয়লাভ করেছে বিজেপি। এনিয়ে একটি পরিসংখ্যানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। আমেদাবাদে ১৫৬টি আসনের মধ্যে ১২৯টি, সুরাটে ১১৪টি পুর আসনের মধ্যে ৯৪টি-তে, রাজকোট পুরসভায় ৬৯টি আসনের মধ্যে ৫৮টিতে, ভাবনগরে পুরসভার ৫১টি আসনের মধ্যে ৪১টি-তে জয়লাভ করেছে বিজেপি। পরিসংখ্যানই বুঝিয়ে দিচ্ছে, কি শোচনীয়ভাবে গুজরাটের সাম্প্রতিক পুরভোটে পর্যুদস্ত হয়েছে কংগ্রেস। এই

৬টি পুরসভার মধ্যে বিজেপির পক্ষে সবচেয়ে 'খারাপ ফল' হয়েছে জামনগরে। জামনগর পুরসভাতেও ৫৭টি আসনের মধ্যে ৩৫টিতেই জিতেছে বিজেপি! প্রসঙ্গত, গুজরাটে ৫৩টি পুরসভার মধ্যে বিজেপির দখলে রয়েছে ৪২টি, কংগ্রেসের ৪টি ও অন্যান্যরা ক্ষমতায় রয়েছে ৭টি পুরসভায়। পুরসভার পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচনেও বিজেপি প্রার্থীদের জয়জয়কার। ২৪টি জেলার মধ্যে ২১টি জেলা পরিষদই দখলে এসেছে বিজেপির, কংগ্রেস পেয়েছে ২টি, শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১টি জেলা-পরিষদের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। ২০৮টি পঞ্চায়েত সমিতির মধ্যে বিজেপি জিতেছে ১৫৫টি-তে, কংগ্রেস ৩৭টি এবং ৬টি-র মীমাংসা শেষ খবর অনুযায়ী হয়নি। বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ, সাম্প্রতিক নির্বাচনে গুজরাটের সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ এলাকায় কংগ্রেস একপ্রকার ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেছে। এমনকী আনন্দ এবং খেদা এলাকাতেও কংগ্রেসের ফল মারাত্মক খারাপ। সবচেয়ে মজার কথা হলো, 'আনন্দ' কংগ্রেসের নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভরত সিং সোলাঙ্কি এবং 'খেদা' কংগ্রেসের হেভিওয়েট নেতা দীনেশ প্যাটেলের খাস-তালুক বলে পরিচিতা।

মোদীর এই অসাধারণ সাফল্যের পরও কংগ্রেসী মার্কাওয়ালা সংবাদমাধ্যমের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বিস্মিত হচ্ছিলেন যে অ্যান্টি ইনকাম্বেন্সী ফ্যাক্টর (ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে ভোটদানের প্রবণতা) গুজরাটে নিষ্ক্রিয় কেন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত,—এর জন্য দায়ী কংগ্রেসই। কারণ তাঁদের মতে, কংগ্রেসকে বুঝতে হবে যে নরেন্দ্র মোদী এখন গুজরাটের উন্নয়নের প্রতীক। বিশেষ করে নর্মদার তীরে ১৮২ ফুট উঁচু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তি (যার পোষাকী নাম 'স্ট্যাচু অব্ ইউনিটি) স্থাপন করে 'গুজরাট অস্মিতা'র জোরালো সেন্টিমেন্ট রাজ্যবাসীর কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাছাড়া উন্নয়নের প্রশ্নে মোদীর আপস না করার মানসিকতা, পক্ষপাতহীন মনোভাব রাজ্যের মানুষের কাছে বিশেষ সমাদর পেয়েছে। যে কারণে মুখ্যমন্ত্রীত্বের দশ বছর অতিক্রান্ত হলেও রাজ্যবাসীর কাছে তিনি চিরনতুন। তার ওপর কংগ্রেস মোদীকে অপদস্থ করবার জন্য নিত্য-নতুন ষড়যন্ত্র করে চলেছে। কখনও স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট)-কে গোধরা কাণ্ডে তাঁর পেছনে লাগিয়ে দেওয়া, কখনও তাঁরই মন্ত্রিসভার সদস্য অমিত শাহের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে ব্যবহার করা, এছাড়া কেন্দ্রীয় বঞ্চনা তো রয়েইছে। এনিয়ে রাজ্যবাসীর কংগ্রেস বিরোধী ক্ষোভই ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হচ্ছে বলে বিশ্লেষকদের অভিমত।

কর্ণাটককে অশান্ত করার কংগ্রেসী চক্রান্ত ব্যর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কর্ণাটক সরকারের এতটা বেয়াদপি সহ্য করার কথা নয় সোনিয়া-মনমোহনের। প্রথমত, বিশ্বজুড়ে চলা আর্থিক মন্দা ও তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ততোধিক আর্থিক দুরবস্থার মধ্যেই ব্যাঙ্গালোর তার আই টি শহরের মর্যাদা যথোচিত সম্মানের সঙ্গে শুধু ধরেই রাখেনি, উপরন্তু দিনকে দিন উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। তথ্যপ্রযুক্তির পাশাপাশি কৃষিতেও সাম্প্রতিককালে আশাতীত সাফল্যলাভ কর্ণাটকের বিজেপি সরকারের। কৃষি-শিল্পের পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নেও অগ্রণী সে রাজ্যের বিজেপি সরকার। তবে কর্ণাটকে সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য অন্যত্র। মাসখানেক আগে অবধিও সেখানে কোনও রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই উন্নয়নের তরী বেশ ভালভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল সেরাজ্যে। কোনও রাজ্য সরকারের এহেন স্পর্ধা, তাও দক্ষিণ ভারতের মতো রাজ্যে একেবারেই বোধহয় সহ্য হচ্ছিল না সোনিয়া গান্ধী তথা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের। রাহুল গান্ধীও সেখানে অচল আধুলি। তাই কর্ণাটকের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত করতে শুরু হয়েছিল কংগ্রেসী ষড়যন্ত্র। তবে মুখ যে এভাবে পুড়বে ঘুণাক্ষরেও বোধহয় কল্পনা করতে পারেনি ষড়যন্ত্রকারীরা।

মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে দু'দুবার আস্থাভোট গৃহীত হলো কর্ণাটক বিধানসভায়। দু'বারই স্বতন্ত্র ব্যবধানে জয় ইয়েদুরাপ্পা সরকারের। দলত্যাগ বিরোধী আইনে এগারো জন বিদ্রোহী বিজেপি বিধায়ককে বরখাস্ত করেছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ কে জি বোপাইয়া। অধ্যক্ষের সিদ্ধান্তে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করে সেখানকার রাজনৈতিক বাতাবরণ উত্তপ্ত করে দেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল হংসরাজ ভরদ্বাজ। কোনও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান তাঁর দলের স্বার্থে কতটা পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারেন তার নগ্ন দৃষ্টান্ত হয়ে রইলেন ভরদ্বাজ। এই ব্যক্তিটি রাজ্যপাল হওয়ার আগে কংগ্রেসের সাংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন। তার আগে দীর্ঘদিন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝেই তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যে রিপোর্ট পাঠান তাতে শিষ্টাচারের লেশমাত্র ছিল না। ইয়েদুরাপ্পা সরকার আস্থা প্রস্তাবে ধ্বনি ভোটে জিতলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ জানিয়ে রাজ্যপালের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, আস্থা ভোট ছিল আদতে 'চরম প্রহসন'। কারণ বিধানসভা কক্ষের প্রবেশপথে ব্যাঙ্গালোরের পুলিশ কমিশনারকে দাঁড় করিয়ে রেখে কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা সিদ্ধারামাইয়াকে নাকি ঢুকতে দেওয়া হয়নি। যদিও এই দাবির স্বপক্ষে সেই রিপোর্টে ন্যূনতম প্রমাণটুকুও হাজির করতে পারেননি ভরদ্বাজ। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে বলা হয় সরকারকে বরখাস্ত করে অবিলম্বে ৩৫৬ ধারার মাধ্যমে কর্ণাটকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা ছাড়া আর কোনও পথ নাকি খোলা নেই তাঁর সামনে।

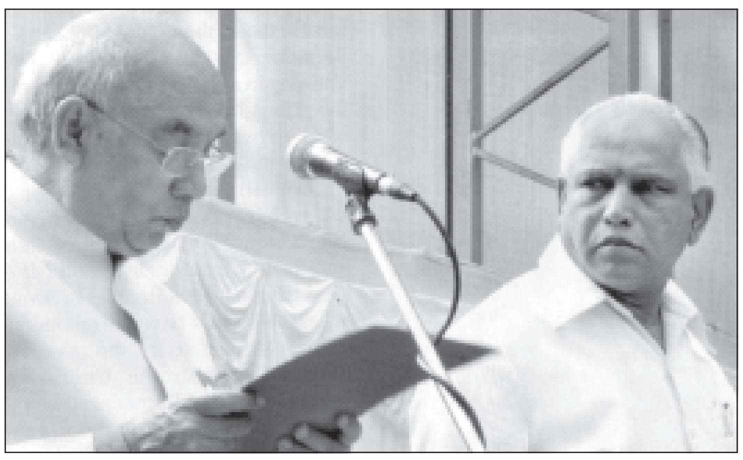

রাজ্যপাল ও ইয়েদুরাপ্পা।

রাজ্যপালের এই রিপোর্টে রীতিমতো উৎফুল্ল হয়ে ওঠে কংগ্রেস নেতৃত্ব। দলেরই একাংশের ভিন্নমত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেবেগৌড়ার জনতা দল (সেকুলার)-এর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ঘোড়া-কেনাবেচায় নেমে পড়ে তারা। সংবাদে প্রকাশ, বিজেপি-র কয়েকজন বিধায়ককে ২৫ কোটি টাকা পর্যন্ত 'অফার' দেবার পাশাপাশি মন্ত্রিত্বেরও টোপ দেওয়া হয়। দেবেগৌড়ার পুত্র এবং কর্ণাটকের মসনদে অল্পদিন বসার স্বাদ পাওয়া এইচ ডি কুমারস্বামী তার পূর্ণ সময়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে স্বয়ং একাজে নামেন বলে অভিযোগ। কংগ্রেসের মদতে তিনি আস্থা ভোটাভুটির সময় সেই বিদ্রোহী বিধায়কদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য গোয়ায় নিয়ে গিয়ে একটি রিসর্টে লুকিয়ে রাখেন বলে মারাত্মক অভিযোগও উঠেছে। সে রাজ্যের বিজেপির পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি সি-ডি-তে দেখা গেছে যে আপ্পাচু রঞ্জন নামে বিজেপির এক বিদ্রোহী বিধায়ককে ২৫ কোটি টাকা ঘুষ ও নিজের সরকারে ক্যাবিনেট মন্ত্রী করার প্রস্তাব দিচ্ছেন কুমারস্বামী।

তবে রাজ্যপালের কর্ণাটকে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সুপারিশ নিয়ে বিশেষ ভুল করতে চায়নি কংগ্রেস হাইকম্যান্ড। সোনিয়া-প্রণবরা বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন তড়িঘড়ি সে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করলে তা রাজনৈতিকভাবে ব্যুমেরাং হতে পারে, 'শহীদে'র মর্যাদা পেয়ে যেতে পারে কর্ণাটকের বিজেপি সরকার। দ্বিতীয়ত, এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে বিজেপি সুপ্রিম কোর্টে গেলে কেন্দ্রের পরাজয় অবধারিত ছিল কিংবা রাজ্যসভাতেও সরকার পক্ষের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না যা দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনের সরকারি সিদ্ধান্তকে টিকিয়ে রাখা যেতে পারে। সুতরাং ওই পথে না গিয়ে কর্ণাটক সরকারকে ল্যাজে খেলাতে গিয়ে সরকারের এতদিনের উন্নয়ন, কর্মপ্রচেষ্টা, রাজ্যের সমৃদ্ধিকে ধূলিসাৎ করার একটা চেষ্টা করে কংগ্রেস। এক্ষেত্রে তাদের মস্তবড় হাতিয়ার ছিলেন রাজ্যপাল হংসরাজ ভরদ্বাজ স্বয়ং।

তবে ২-১ ব্যবধানে কর্ণাটক হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, যে সিদ্ধান্ত বিদ্রোহী এগারো জন বিধায়ককে কর্ণাটক বিধানসভার স্পিকারের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তেরই অনুরূপ তা যেমন রাজ্যের বিজেপি সরকারকে মজবুত রাজনৈতিক বুনিয়াদের ওপর দাঁড় করাল তেমন অন্যদিকে রাজ্যবাসীরও অশেষ ধন্যবাদার্হ হলো। তথ্যাভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কর্ণাটকের উন্নয়নের রথ থমকে দেবার ষড়যন্ত্রকারী কংগ্রেস এবং তার দোসর জনতা দল (সেকুলার) এর মোক্ষম জবাব পেয়ে যাবে আগামী বিধানসভা ভোটেই।

গল্প

লোভ

।। রতন জ্যোতি রায়।।

গ্রামের নাম সুলতানপুর। এক সময় সুলতানপুর ছিল পূর্ববঙ্গে। দেশভাগের সময় ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অসীম প্রচেষ্টার ফলে সুলতানপুর আজ পশ্চিমবাংলারই একটি গ্রাম। কিন্তু হলে কি হবে, বাংলা বলতে যে শস্য-শ্যামলা-সুজলা-সুফলা রূপটি মনের মধ্যে ভেসে ওঠে, সুলতানপুরের ক্ষেত্রে তা একেবারেই নয়। ক্ষেতের পর ক্ষেত ফাঁকা ধু ধু প্রান্তর, সবুজ বিহীন-শস্যহীন, কোথাও কোথাও জঙ্গল-ঝোপঝাড়, যতদূর দৃষ্টি যায় একই দৃশ্য।

এ হেন সুলতানপুরে হাসান মোল্লার বাস। সংসারে থাকার মধ্যে আছে। স্ত্রী সালমা, পুত্র আমির ও জামির এবং কন্যা নগমা। অভাব-অনটন, কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্যেই দিন যায় এদের। কিন্তু এমনটি আগে ছিল না। এককালে হাসান মোল্লাদের অবস্থা ভালোই ছিল। ভিটেমাটিতে দাঁড়ানো ইটের বাড়ীটি আজও তার সাক্ষী হয়ে আছে কিন্তু আর বেশিদিন যে থাকবে না, তা এর চুন সুরকি পলেস্তারা ওঠা চেহারাটাই বলে দেয়।

মোল্লা হাসানের আর্থিক অবস্থা তলাতে তলাতে তাকে একদিন দিন-মজুরের রাস্তায় নিয়ে আসে। বাড়ীর অদূরেই মীরপুরের হাট, সেখানেই সে মুটের কাজ করে। দিনান্তে যা রোজগার হয় তাই দিয়েই সংসার চালায়। বয়স বেড়েছে, গায়ে গতরে শক্তি ভাটার দিকে। বাড়ীর পাশে প্রতিবেশী ছইদুল নিজের বয়েল গাড়ী (গরুর গাড়ী) ভাড়া খাটায়, দিন গেলেই শ-পঞ্চা'শ টাকা করে নিয়ে আসে। মোল্লা হাসানের খুব ইচ্ছা করে সেও একটা বয়েল গাড়ী করে। কিন্তু টাকার হদিস পায় না। হাজার তিনেক টাকা হলে এমনি একখান গাড়ী করা যায় বটে কিন্তু আশা দুরাশাই।

বড় ছেলে আমির হাতে পায়ে একটু বড় হয়ে উঠেই আববার সাথে মুটের কাজে হাত লাগায়—দুটো পয়সা নিয়ে আসে, সংসারের কাজে লাগে।

ছোটো ছেলে জামির ও মেয়ে নগমা মক্তবে যাতায়াত করে। আম্মা সালমার খুব ইচ্ছা ছেলে মেয়ে দুটো আরও কিছু দূর পড়ে। কিন্তু বাধ সাধে মোল্লা হাসানের দারিদ্র্য। বন্ধ হয়ে যায় ওদের মক্তবে যাতায়াত। সালমার কষ্ট হয়, কিন্তু অসহায়।

অভাব অনটনে বিবর্ণ দিনগুলি একের পর এক কালস্রোতে এগিয়ে চলে। হাসান মোল্লার ছেলে-মেয়েরাও বড় হয়ে ওঠে। সংসারে খরচ বাড়তে থাকে, হাসান মোল্লার শক্তি কমতে থাকে।

নগমার নিকার বয়স হয়। আম্মা সালমা উদ্বিগ্ন। হাসান মোল্লা নিরূপায়-নির্বিকারও। বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে হাসেন। নগমার নিকার লগ্ন এগিয়ে আসে। পাত্র মিরজাপুরের মহম্মদ কাশেম। ছেলে হিসাবে ভালই। আম্মা-আববা অল্পবয়সেই তাকে অনাথ করে আল্লার পিয়ারে হয়ে গেছেন। চাচা-চাচীর কাছেই মানুষ। তারাও নিঃসন্তান। কাশেম স্নেহ-ভালবাসার প্রাচুর্যেই বড় হয়ে ওঠে।

কাশেমের চাচা আব্দুল মিঞা রিক্সা চালাতেন। গায়ে গতরে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠতেই একদিন চাচার হাত থেকে রিক্সা কাশেম নিয়ে নেয়— চাচাকে অবসর দেয়। সেই হতেই কাশেম রিক্সা চালায়, পরিচয় হয় রিক্সাওয়ালা। ওখানেই আপত্তি আম্মা সালমার ও মেয়ে নগমার। কিন্তু বড় ছেলে আমির ও মোল্লা হাসানের পীড়াপীড়িতে আপত্তি টেকে না, রাজী হতেই হয়।

ভালভাবে নিকার পাট চুকে যেতেই নববধূ নগমা আববা হাসান মোল্লার সুলতানপুরের বাড়ী ছেড়ে এসে পড়ে মিরজাপুরের মহম্মদ কাশেমের বাড়ীতে। মাটি-কোঠার বাড়ী কিন্তু সযত্নে সাজানো, নগমার ভালোই লাগে।

দিন যায় রাত আসে, রাত যায় আবারও দিন আসে। নগমা ঘর সংসার সামলায়। কাশেম রিক্সা চালায়— পয়সা

কামায়। বিবির কথায় পয়সা জমায়। কেটে যায় দুটো বছর। নগমার কোলে কোনও সন্তান আসে না। আশপাশের মেয়ে মহল থেকে গুঞ্জন— বিবি বোধহয় অক্ষম। নগমা শুনেও শুনে না। এই নিয়ে কাশেমও যে তাকে কখনও কখনও বলে না তা' নয়, কিন্তু নগমা শুধু হাসে আর বলে, "আগে টাকা জমাও মিঞা— তারপর দেইখ্যা আল্লা সময় হইলে সব দিবো।" কাশেম আর কিছু বলে না। সেদিন ছিল খুশীর দিন "ঈদ"— কাশেম রিক্সা নিয়ে বেরোয়নি। 'ঈদ', গাঁয়ে নমাজ পড়ে। বাড়ীতে এসে বিবিকে রান্নায় সাহায্য করে। দিনটা আনন্দে উৎসবে কেটে যায়। রাত্তিরে কাশেমের তেমন কিছু খাওয়ার প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও বিবির পীড়াপীড়িতে অল্প কিছু খেতেই হয়। শোবার ঘরে এসে বিছানায় গা'টা এলিয়ে দিয়ে নগমার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকে। এমনটি সে রোজই করে। যায় বটে আগে, কিন্তু ঘুমায় এক সাথেই। রান্নাঘর বন্ধ করে নগমাও এসে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাশেমের পাশটিতে এসে বসে। 'কি মিঞা— ঘুমাইছ নাকি?" কাশেম বলে 'না'। হঠাৎ ক'রে নগমা তার ডান হাতখানি কাশেমের সামনে প্রসারিত ক'রে বলে, 'মিঞা আমার মোহরের পাঁচ হাজার টাকা আমারে দাও।' কাশেম বিস্ময়ে বিমূঢ়। মনে মনে ভাবে, বলে কি বিবি, এ যে তালাকের পরের কথা। কিন্তু এখনো তালাকই হয়নি। আর তা হবেই বা কেন? বিস্মিত কাশেম বিবির মুখের দিকে তাকায়। নগমা এবার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে বলে, 'ঠিক আছে হুজুর এক টাকা না হয় চাইলাম না। ওই পাঁচ হাজারই আমারে দাও।' কাশেমের মন থেকে যেন জগদ্দল পাথরটা সহসা সরে যায়। বুঝতে পারে ব্যাপারটা হালকা। তাও বিস্ময়ের ঘোর কাটে না বলে "হঠাৎ কইর‍্যা টাকা তুমি কি করবা?" নগমা বলে "আববার সাথে কথা হইয়াছে, মীরপুরের হাটে কম পয়সা সেলামী দিয়া দোকান ঘর ভাড়া পাওয়া যায়, তুমি একখান দোকান ঘর ভাড়া নাও। সেহানে একটা ব্যবসা কর। এই রিক্সাটা ছাইড়্যা দাও।' নিজের ঐকান্তিক ইচ্ছাটা আম্মির উপর চাপিয়ে দিয়ে বলে, "আম্মির খুব ইচ্ছা তুমি রিক্সা ছাইড়্যা কারবার কর।' কথাগুলো কাশেমকে খানিক ভাবায়। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোয় না। নগমা কাশেমের আরও একটু কাছে এসে বসে। হাত দুটো ধরে বলে—"কী গো কথা কও না", কাশেম এবার একটা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলে, "দ্যাহ, রিক্সা চালাইতে আমারও খুব একটা ভালো লাগে না। রিক্সাওলারে কেউ ইজ্জত দেয় না। আইজ অবধি তুই-তুকারী

সাহিত্যের পাতা

ছাড়া আপনি কইলো না।" কাশেমের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নগমা বলে, "তাই তো কই যত তাড়াতাড়ি পার রিক্সাটারে বিদায় কইর‍্যা দাও।"

কাশেমের কাছে পাঁচ হাজার নয়, আট হাজার টাকা আছে। তিল তিল করে সে বিয়ের পর টাকা জমায়— অবশ্য তাতে নগমার অবদান কিছু কম নয়। কারণ তার যা কিছু জমেছে সবই বিয়ের পর এবং তাও নগমার সংযমী খরচের জন্য।

শেষ পর্যন্ত কাশেম রাজী হয়। তবে দোকান ঘর কেনা পর্যন্ত। ব্যবসার কথা পরে ভাবলেও চলবে। নগমা তাতেই খুশী, কাশেমকে বলে, "তুমি টাকাটা নিজের হাতে কইর‍্যা দোকানের মালিকরে দিবা। আববার হাতে যেন টাকা না পড়ে। তবে আববারে সব সময় তোমার লগে লগে রাইখ্যা। দু-চারজন লোকরে সাক্ষী রাইখ্যা লেহাপড়া কইর‍্যা নিবা।" নগমা তার আববা থেকে সবসময় সাবধানে থাকতে চায়— কারণ সে জানে আববার হাতে টাকা পড়লে সে টাকা ডানা মেলে উড়ে যাবে।

পরের দিন সকাল হতেই কাশেম পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে কোমরে পোটলা করে বেঁধে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা হয়। কিছুক্ষণ চলার পর পেছন ফিরে দেখে নগমা ছুটতে ছুটতে আসছে। কাশেম দাঁড়িয়ে পড়ে, নগমা কাছে এসে বলে, "তুমি বাড়ী থাইক্যা বাইর‍্যা আওয়ার পর ভাবতাছি অতগুলান টাকা নিয়া যাইতাছ— তোমারে একল্যা ছাড়া বোধহয় ঠিক হইতাছে না— তাই চাচীরে ঘরের চাবি দিয়া চইল্যা আইলাম। আবার কাইলকাই না হয় ফিরা আহন যাইবো।"

দুপুরের কিছু আগেই ওরা সুলতানপুরে এসে পৌঁছায়। শাশুড়ি মেয়ে জামাইকে দেখে খুশী। হাসান মোল্লা এবং বড় ছেলে আমির তখনও কাজ থেকে বাড়ী ফেরেনি। ছোটো ছেলে জামির পাশের বাড়ীতে। খানিক বাদেই একে একে সবাই বাড়ীতে এসে ঢোকে। আববাজান হাসান মোল্লা মেয়ে নগমাকে দেখে খুশী' তবে কিছুটা বিস্মিত। "কী রে, কোন খবর না দিয়াই যে হটাৎ চইল্যা আলি? নগমা বলে, "আববাজান তোমার দামাদও এয়েছে।" বলেই হাসান মোল্লার হাত ধরে উঠানের এক প্রান্তে একান্তে নিয়ে গিয়ে নীচুস্বরে বলে, "আববাজান তুমি— কইছিলা, মীরপুরের হাটে দুকান পাওয়া যায়। তোমার জামাই একটা দুকান কিনার লাইগ্যা এয়েছে।" হাসান মিঞা বলে, "সে তো অনেক টাকা-পাঁচ/সাত হাজার টাকা লাগবো।" নগমা বলে, "সাত পারুম না কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা তোমার জামাই লগে নিয়া আইছে। হইবো না?" হাসান মোল্লা বলে, "মনে হয় হইবো। কাইলকা দুকানের মালিকের লগে কথা কইয়্যা দেহন লাগবো। তুই ভাবিস না আইজকার রাতটা যাইতে দে। টাকাটা কই?" নগমা বলে "তোমার জামাইয়ের কাছে রইছে।" হাসান মোল্লা কি যেন ভাবে, একটু অন্যমনস্ক হয়। নগমার দৃষ্টি এড়ায় না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর হাসান মোল্লা অন্যান্য দিনের মতো আর কাজে বেরোয় না কিংবা আমিরকেও কাজে যেতে বলে না। গোটা বিকালটা বিছানায় শুয়েই কাটায়। আম্মি সালমা ও নগমা রান্না ঘরের কাজকর্ম সেরে শোওয়ার ঘরে ঢোকে একটু বিশ্রাম করবে বলে। জামির তার দুলা ভাইকে নিয়ে ভিডিও হলের দিকে যায় সিনেমা দেখতে। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। হাসান মোল্লা আমিরকে নিয়ে হঠাৎ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে। নগমা শুয়ে শুয়ে আম্মিজানের সঙ্গে কথা বলছিল। আববাজান ও ভাইজানের ওইভাবে উঠে পড়া নগমার কাছে কেন যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকে।

কপট ঘুমের ভান করে কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে থেকে নগমা উঠে পড়ে। আম্মিজান ঘুমিয়ে থাকে। নগমা আববাজানের পিছু নেয়। দেখে হাসান মোল্লা গোয়াল ঘর থেকে খেজুর গাছ কাটা হাসুয়াটা হাতে নিয়ে বাড়ীর পিছনে জঙ্গলভর্তি কবরস্থানের দিকে দ্রুত চলে যায়। অজানা এক বিপদের আশঙ্কায় নগমার বুকটা যেন কেঁপে ওঠে। উঠানের একপাশে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ নগমা সম্বিৎ ফিরে পায়। একরকম যন্ত্রচালিতের মত ছুটে চলে ভিডিও হলের দিকে। একজনকে দিয়ে কাশেমকে ডাকে। কিছুক্ষণ পরে কাশেম হল থেকে বেরিয়ে আসে। নগমাকে দেখে তার আশ্চর্য লাগে। নগমা তাকে কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই হাত ধরে টানতে টানতে হলের কাছেই একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে আসে। অন্ধকার দ্রুত এগিয়ে আসে। কাশেমের হাতটা ছেড়ে দিয়ে নগমা বলে, "দ্যাখ আববাজানের চালচলনডা কেমন যেন লাকতাছে, আমি আমার আববাজানরে ভালো কইর‍্যা চিনি—এমন কাম নাই যা হে করা পারবো না। তুমি টাকাডা আমারে দাও, আর আজ রাইত কইর‍্যা আমাগো বাড়ী না যাইয়া রাইত্ডা কোনহানে কাটাইয়া দিয়া কাইলক্যা সকাল বেলায় মিরজাপুরে চইল্যা যাওগা। আমি কাইলক্যা বিকালের দিকে যামু। আম্মি বা অন্য কেউ কিছু জিগাইলে যাই হোক একডা কিছু কইয়া অগো বুঝামু।" কথা কটি রুদ্ধশ্বাসে বলেই নগমা টাকাটা নিজের কাছে নিয়ে দ্রুত বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। কাশেম—হতবুদ্ধি, বিস্ময়, বিমূঢ়। ঘোর কাটতেই কাশেম আস্তে আস্তে ভিডিও হলের কাছেই একটা চায়ের দোকানে রুটি তরকারি খেয়ে দোকানদারকে পয়সা দিয়ে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে চলতে থাকে। কোথায় যাবে জানে না। দু'বছর হলো তার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু বার তিন চারেকের বেশী সে সুলতানপুরে আসেনি। রাস্তাঘাট কিছুই চেনে না। আজ সে বেশ বিপদেই পড়ে যায়, কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থেকে রাতটা কাটাতে হবে— এইটুকুই এখন একান্ত কাম্য, রাস্তায় চলতে থাকে, সামনে অদূরে একটা আলো দেখতে পায়। বোধহয় রাস্তা দিয়ে কেউ হাট থেকে বাড়ী ফিরছে। পাছে তাকে দেখতে পায় এবং চিনে ফেলে এই ভয়ে কাশেম রাস্তা ছেড়ে দিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। আলোটা আরও এগিয়ে আসে। কাশেম আরও জঙ্গলের ভেতরে ঢুকতে থাকে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকার! নিজের শরীরটাই ভালোভাবে দেখা যায় না। কাশেম অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়— আসল ভয় মানুষ নিয়ে— এই জঙ্গল আর যাই

(এরপর ৯ পাতায়)

স্বস্তিকা পূজা সংখ্যা - ১৪১৭ একটি পর্যালোচনা

দুই মলাটের মধ্যে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসের এক অনন্য সমাবেশ

।।শমিতা সাহা।।

স্বস্তিকার পাঠকমাত্রই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে পুজো সংখ্যাটা কেমন হবে। পাঠককুলকে নিরাশ করেনি এবারের পুজো সংখ্যা। বেশ কয়েক বছর ধরে স্বস্তিকার পুজো সংখ্যার উৎকর্ষের উত্তরণ হচ্ছিল। আর পাঁচটা পূজাবার্ষিকীর মতো স্বস্তিকাও গল্প-উপন্যাসে সাজানো থাকলেও স্বস্তিকার বৈশিষ্ট্য একটু অন্যরকমের। কারণ স্বস্তিকায় থাকে বেশ কিছু প্রবন্ধ যা জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান আহরণের পরিসরকে ব্যাপ্ত করে।

এবার আসা যাক এবারের স্বস্তিকায় বিভিন্ন বিষয়গুলি কেমন হয়েছে। প্রথমেই বলি নবকুমার বাবুর উপন্যাস 'শিমূলবাড়ির' কথায়। স্বস্তিকায় পাঠককুলের অনেকেরই অজানা যে, নবকুমার বাবুর পিতৃদেব ছিলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্য যাঁর রচনায় সমৃদ্ধিলাভ করেছে সেই সমরেশ বসু বা কালকূট। সাহিত্যচর্চায় অনন্যতা বজায় রেখেই 'শিমূলবাড়ির' এই রচনা। বিদেশের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসের কাহিনির বিন্যাস সুখপাঠ্য। কাহিনিটা শুরু প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার জয়দেব রায় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে তাঁর জীবিকা শুরুর মধ্য দিয়ে। রীণা-ববি-লিসাকে নিয়ে ডাঃ জয়দেবের সুখের সংসার বলয়। এই বলয় কেটে যায় ক্যান্সার আক্রান্ত বন্ধু প্রতিবেশী ক্যাথি বেনেটের মৃত্যুর পর। লিসা প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে ক্যাথির স্বামী জেফরির সঙ্গে। পিছনে ফেলে আসে জয়দেবের সুখের সংসার। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় লিসার দুই সন্তানের স্বপ্ন। ব্যাপারটা অভাবনীয় হলেও নবকুমার বাবুর লেখনীর স্পর্শে চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়ে ওঠেছে। শেষমেশ জয়দেবকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় রীণা-ববিকে নিয়ে দেশে ফেরার। খুঁজে বেড়াতে হয় তাঁর প্রাক্তন প্রণয়ী তনুশ্রীর ছত্রছায়ায়। নবকুমারবাবু একটা জিনিস সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন— বিদেশ বিভুঁইয়ে বিয়েটা বাণিজ্যিক চুক্তির মতো এক চুক্তি। হৃদয়ের বন্ধন সেখানে অনুপস্থিত। বিষময় এই ব্যাধি সাগর পেরিয়ে যেন সুনামির মতো এদেশকেও আচ্ছাদিত করতে চাইছে। জয়দেব চাইছেন না তাঁর মেয়ে-ছেলেকে কোনও বোর্ডিং হাউসে রাখতে। লিসার মতো এক মাকে খুঁজতে চাইছেন। তাইতো এতবছর বাদে তাঁর প্রথম জীবনের প্রেমিকার কাছে আশ্রয় খুঁজতে চাইছেন নিজের ও তাঁর সন্তানদের।

কিংবা ধরা যাক গোপালকৃষ্ণ রায়ের 'আত্মজা'র কথা। গোপালবাবু বেশ কয়েকবার স্বস্তিকায় লিখেছেন। এবারের গল্পটা অন্য এক নতুন মাত্রা-র। গরীবির তাড়নায় অসহায় এক বাবা চন্তাই মিস্ত্রি তার বড় মেয়েকে বিক্রি করে দিতে চায় টিপাইপুরের নারী ব্যবসায়ী কেশিয়ারীর হাতে। মেয়ে টুকি চন্তাই মিস্ত্রির এতদিন সংসার আগলে রেখেছে। চন্তাইয়ের স্ত্রী অন্ধ। টুকি সংসারকে সামলায়। এরকম এক সোমত্ত মেয়েকে কেশিয়ারীর মতো পাষণ্ডের হাতে ছেড়ে দিতে চন্তাইয়ের মন কিছুতেই সাড়া দিচ্ছিল না। রাতের অন্ধকারে টুকির হাত ধরে যখন দিনের প্রথম গাড়ী ধরে ভগবানগোলা স্টেশনে যাবার লক্ষ্যে বেরোয় তখন টুকি যেভাবে বাবাকে সতর্ক করে দেয় গোপালবাবুর কলমের খোঁচায় তা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে। গল্প লেখায় সিদ্ধহস্ত গোপালবাবু তাঁর এই গল্পটি মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন।

জন্মলগ্ন থেকেই স্বস্তিকা বিখ্যাত তার প্রবন্ধ রচনা দিয়ে। অনেক স্বনামধন্য ব্যক্তি নিজস্ব রচনাশৈলীর মাধ্যমে স্বস্তিকাকে সমৃদ্ধ করেছেন। এমন-ই এক ব্যক্তি রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী। 'অনার কিলিং' রচনায় তিনি মুসলমান সমাজের অমানবিকতা চিত্রটা নিপুণ হস্তে চিত্রায়িত করেছেন। পেশায় অধ্যাপক তথা পদার্থবিদ রাধেশ্যামবাবু মুসলমান সমাজের মহিলাদের ওপর পুরুষদের সীমাহীন নির্যাতনের কাহিনি পাঠকবর্গের কাছে উত্থাপিত হোত না যদি রাধেশ্যামবাবু আমাদের না জানাতেন।

অন্যদিকে জিষ্ণু বসুর 'স্বাধীন দেশের পরাধীন নাগরিক' গল্পটা মনকে পীড়া দেয় যখন জানা যায় কাশ্মীরের ডোগরা বংশোদ্ভুত রজনীশ প্রেমাসক্ত হয়ে মুসলিম কন্যা সাবীনের সঙ্গে। সাবীনের চাপেই শেষমেশ রজনীশ সাদী করে সাবীনকে। এরপর কীভাবে মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে সাবীনের পরিবারের প্ররোচনায় রজনীশ অত্যাচারিত হয় থানায় এবং নৃশংসভাবে খুন হয় তারই এক মর্মস্পর্শী দলিল এই বড় গল্পটি। জিষ্ণুবাবু তাঁর এই গল্পটার মাধ্যমে যেন এই সতর্কবার্তা হিন্দু পুরুষকুলে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন যে, ভুল করেও কোনও হিন্দুছেলে মুসলিম নারীর প্রেমের খপ্পরে না পড়ে এবং যদি তা বিয়েতে রূপান্তর ঘটে তবে তার পরিণতি বেচারা রজনীশের মতো হতে পারে। আজকাল প্রেম জেহাদের নামে মুসলমান ছেলেরা হিন্দুমেয়েদের বিয়ে করে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির খেলায় যেভাবে নেমেছে তাতে হিন্দুমেয়েদের প্রতিও জিষ্ণুবাবুর এক প্রচ্ছন্ন বার্তা এই গল্পটি।

বৈদ্যনাথবাবু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তো বটেই স্বস্তিকার পুজো সংখ্যায় তিনি নিয়মিত লেখক। বরাবরই তাঁর লেখা সুখপাঠ্য এবং অনেক তথ্যসমৃদ্ধ। এবারের 'এক শিকারী ঈগল এবং রাজকুমারী' উপন্যাসটি এমনই এক দলিল। নবাব সিরাজউদোল্লাকে আমাদের সেকুলারবাদীরা উদার বলে স্তুতিগান গাইলেও সিরাজ যে এক স্বেচ্ছাচারী, নারীবিলাসী এক নবাব— তারই নিদর্শন মেলে বৈদ্যনাথবাবুর উপন্যাসে। কাহিনির বিন্যাসে নবাব সিরাজের কদর্য নারীলোলুপতা নিপুণভাবে উঠে এসেছে এই কাহিনিতে। গায়ক কুন্দনলালের আগাম সতর্কবার্তা না পেলে সুন্দরী নাটোরের রাজকুমারীর ঠাঁই হতো নবাবের হারেমে। অসম লড়াইয়ে পর্যুদস্ত হবে জেনে নাটোরের রাণীকে নবাবের কাছে বার্তা পাঠাতে হয় যে সেদেশে ওলাওঠায় শত শত প্রাণহানি ঘটেছে এবং তাতে সামিল রাজকুমারীও। সেই মিথ্যা প্রচারে নিরস্ত হয় নবাবের হার্মাদ বাহিনী। সে যাত্রায় রক্ষা পায় নাটোরের রাজকুমারী। ধন্যবাদ কুন্দনলাল!

গত বছর থেকে 'এক ছড়া কাহিনি' ছাপছে স্বস্তিকা তার পুজো সংখ্যায়। শিবাশিস দণ্ডের এবারের 'পতিতপাবন গৌরসুন্দর' ছড়া কাহিনিটি এক পূর্ণাঙ্গ কাহিনি চিত্র। নতুনত্বের দাবী রাখে লেখাটা। বর্তমান প্রজন্মে ভুলে যেতে বসেছে ভারত তথা বাংলার অতীত গৌরব। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা যেন সচেতনভাবেই আমাদের অতীতকে ভোলাতে চাইছে। মহাপ্রভু চৈতন্যের গৌরবময় জীবনবৃত্তান্ত বর্তমান প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরা ক'জন জানে? স্বস্তিকার পুজোর সংখ্যা যেন সেই দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে শিবাশিসবাবুর লেখাটা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন।

তবে প্রত্যাশা মতো লেখা হয়নি শেখরবাবুর। 'প্রবাহ' গল্পটি সাদামাটা একটা গল্প— পাঠকমনে তেমন একটা ছাপ ফেলতে পারেনি। কিংবা রমানাথবাবুর রচনাশৈলীতে নতুনত্বের কিছু নেই। তাঁর লেখা 'টুনি আর আমি' গল্পের স্টাইলটা পুরাতন এবং তাঁর এই স্টাইলে পাঠকরা বিশেষত আমি ক্লান্ত। শেখরবাবু বা রমানাথবাবুর কলম থেকে আরও সুন্দর রচনা আমরা আগামীদিনে আশা করব।

গতবারের মতো এবারেও সুমিত্রা দেবীর রচনা অনবদ্য। 'মাঝের দরজা'— উপন্যাসটির কাহিনি যেন লেখিকা আমাদের দৈনন্দিন সাংসারিক কাজিয়াকে আমাদের মতো করে উত্থাপন করেছেন। তাঁর রচনার মাধ্যমে আমরা একাত্ম বোধ করি। কাহিনির মূল চরিত্র সৃজা এক আবেগ প্রবণ মহিলা। অল্প বয়সে দুর্ঘটনায় একসঙ্গে বাবা -মাকে হারিয়ে পিতৃকুলের বিশাল অর্থভাণ্ডার থেকে বঞ্চি তা এক নারী মাতুলাশ্রয়ে বড় হয়েছে। যৌবনে মামা-মামী-ই তার অভিভাবক। সুপাত্রস্থও করেন তাঁরা। কিন্তু বিয়েটা টেঁকে না। স্বামীর মাসীমার কু-মন্ত্রণায় ইচ্ছা-অনিচ্ছায় স্বামী জড়িয়ে পড়ে দাম্পত্য কলহে। স্বামী চায় সৃজা তার পৈতৃক সম্পত্তির দাবিদার। সে মামলা করতে চায় সৃজার কাকার বিরুদ্ধে। আবেগে আপ্লুত সৃজা যায়নি। নিগৃহীত হয় সে। তারপর পতিগৃহ ছেড়ে কলকাতায় চাকরিসূত্রে এক পেইং গেস্ট হয়ে থাকে এবং সেখানেও সে হরপ্রীত নামে এক স্বামীহারা মহিলার সাথে। হরিয়ানার এই মহিলা সৃজাকে বোঝায় সামান্য একটা দাম্পত্য কলহকে কেন্দ্র করে সৃজা যেন শ্বশুরবাড়ি পরিত্যাগ না করে। যখন সৃজার স্বামী শ্রীমন্ত, তাঁর সহোদর, তাঁর বাবা, মা সবাই তাঁকে ফিরে পেতে চায়। হরপ্রীত বোঝায় সে আজও তার স্বামীর প্রতীক্ষায়। নারী জীবনে স্বামীর ভালবাসা সবচেয়ে বড় পাওনা, যা থেকে হরপ্রীত বঞ্চি ত। হরপ্রীত বলে তোমার আর তোমার স্বামীর মনের মাঝের দরজার বন্ধন খুলে গেল। 'মাঝের দরজা' কাহিনিটির নামকরণের সার্থকতা এখানেই। সৃজা বোঝে তার ভুল। সুমিত্রা দেবীর কাহিনি এখানেই শেষ। পাঠকদের মনে খানিকটা অতৃপ্তি রেখেই কাহিনিটা শেষ করলেন সুমিত্রা দেবী। প্রশ্ন থেকেই গেল সৃজার জীবনের পরবর্তী অধ্যায় কীভাবে শুরু হলো?

সৌমিত্র শংকর দাশগুপ্ত— পূজা সংখ্যা স্বস্তিকার পাঠকদের কাছে এক পরিচিত নাম। বেশ কয়েকবছর তিনি স্বস্তিকার জন্য কলম ধরেছেন এবং মনোরঞ্জন করেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাস দিয়ে। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য কথাশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবারের ছোট গল্পও তাঁর অন্যান্য বছরের ন্যায় পাঠককুলের প্রশংসা কুড়োবে। এবারের ছোট গল্পের নাম 'অন্ধ অতীত'।

এত কিছুর পরেও কিছু খামতি রয়েছে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যায়। কচি-কাঁচাদের জন্য কিছুই নেই। ১০-১৮ বছরের তরুণ তরুণীদের জন্য সম্পাদক মহাশয় যদি ভাবেন তবে আগামী পূজা সংখ্যায় এক সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসেবে পাঠকবর্গ হাতে পাবে। খেলাধূলার সংবাদ নিয়মিত সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও পূজা সংখ্যায় অনুপস্থিত। এসব বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করলে আগামীদিনে আরও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠবে পূজা সংখ্যা স্বস্তিকা, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

লোভ

(৮ পাতার পর)

থাকুক না কেন মানুষের সাথে আর দেখা হওয়ার আশঙ্কা নেই। পিছন ফিরে কাশেম আবারও আলোটার হদিশ করে, দূরে আরোও দূরে আলোটা সরে যায়। কিন্তু হলে কি হবে কাশেম সড়কের উপর উঠতেই ভয় পায়, তার থেকে জঙ্গলটাকে অনেক নিরাপদ মনে হয়।

কেবল অন্ধকারটা ঘনিয়ে এসেছে। এখনও গোটা রাত পড়ে আছে। মাটিতে সাপ খোপের ভয়! তার থেকে কোনও একটা গাছের ওপরে উঠে বসলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কাশেম সামনে এগোতে থাকে একটা গাছও পেয়ে যায়। গুঁড়িটা লম্বা আর মোটা, কাশেম উপরে উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। অভ্যাস না-থাকলে যা হয়। ওটাকে ছেড়ে দিয়ে সে আবারও এগোতে থাকে, আবারও একটা গাছ— একটা কীসে ধাক্কা লাগে, বুঝতে পারে ঝুড়ি। গাছটা বটগাছই বটে। ঝুরি বেয়েই এবার গাছের একটা ডালে উঠে পড়ে সেটাকে ছেড়ে আরও উপরে ওঠে। ডালটা বেশ চওড়া, বসার ও রাত কাটানোর উপযুক্ত ভেবে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু হায়রে আল্লার কুদরৎ! কাশেম যদি জানতো, সে যার ভয়ে জঙ্গলে ঢুকে নিশ্চিত হতে চায় সে তারই বাড়ীর পিছনে কবরস্থানে এসে আশ্রয় নিয়েছে।

অন্য দিকে হাসান মোল্লার মাথায় একটাই চিন্তা দুপুর থেকে ঘুরপাক খায়। পাঁচ হাজার টাকা অনেক টাকা! সে আর গায়ে গতরে খাটতে পারে না। হাপ ধরে। রোজ জান কবুল করে বাড়ী থেকে বের হয় কাজের জন্য। সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে এসে তবে একটু দম পায়। অনেকদিন থেকেই ভাবছে একটা বয়েল গাড়ী (গরুর গাড়ী) করে ভাড়া ঘাটায়। দুটো পয়সাও আসে, শরীরটাও আরামে থাকে। এর জন্য কার কাছে না পয়সা চেয়েছে, মেয়ের কাছেও চেয়েছে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না। আজ তাকে এই টাকা পেতেই হবে।

সে রাতে হাসান মোল্লা আমিরকে নিয়ে একটু সকাল সকালই খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

মা ও মেয়ে রান্না ঘরে বসে আছে। কাশেম ও জামিরের খাবার নিয়ে, রাত গড়িয়ে গড়িয়ে— অনেক দূর গড়ায়। আশে পাশের পাড়া প্রতিবেশীরা শুয়ে পড়ে। গোটা গ্রাম অন্ধকারে ডুবে যায়। আম্মি সালমা উদ্বিগ্ন। —"কী রে নগমা এতো রাইত তো হইবার কথা না। কি হইল ছেলে দুইডার।" নগমার নিরুদ্বিগ্ন উত্তর— "ছাইড়্যা দেও আম্মি। হেরা আইলে পরে ডাক দিবো, আমরা খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়ি গা।" মেয়ের নিরুত্তাপ ভাব মাকে একটু যেন নিশ্চিন্ত করে। ওরা খেয়ে শোওয়ার ঘরে গিয়ে দরজা দেয়।

ওইদিকে জামির সিনেমা শেষ হতেই দেখে তার পাশে দুলা ভাই কাশেম কাছে নেই। তাদের বসার জায়গায় আশপাশ দেখে, দূরে দূরে দেখে, হলের চার পাশ দেখে কোথাও নাই। আশ্চর্য! লোকটা গেল কোথায়! নিজে নিজেই ভাবে। হল থেকে বের হয়ে আসে। চা-মিষ্টির দোকানগুলি ঘুরে ঘুরে দেখে, নাই কোথাও নাই। একগাছা উদ্বেগ জামিরের মনে ভিড় জমায়। তাই-তো! দুলাভাই কোথায় যেতে পারে, সহসা তার ডান কাঁধে পিছন থেকে একটা হাত এসে পড়ে। জামির চমকে উঠে, "কেরা?"— "আরে আমি সামিম, সামিম রহমান।"— সামিম রহমান জামিরের সমবয়সী বন্ধু। জিজ্ঞাসা করে— "কীরে, কী ব্যাপার জামির? হঠাৎ ওমন কইর‍্যা চইম্‌কা উঠলি কেনে? কি হয়েচে।" জামির তাকে কাশেমের কথা বলে। সব শুনে সামিম রহমান বলে, "রাইত অনেক হইছে, তুই আগে আমাগো বাড়ী চল"— বলতে বলতে জামিরকে এক রকম টানতে টানতে ভিডিও হলের পিছনেই তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে উঠায়।

সামিমের বাবা তাইদুল মিঞা জামিরের কাছে সব শুনে জামিরকে বলে— "বাবা তোমরা আগে দুইডা খাইয়া লও। তারপর তোমাগোর আমি

(এরপর ১০ পাতায়)

চিঠিপত্র

দেগঙ্গা ও পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ

সম্প্রতি দেগঙ্গা এবং সংলগ্ন এলাকায় হিন্দুদের উপর অত্যাচারের এত বড় ঘটনা ঘটে গেল, কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হলো, পুলিশকে পিটুনি খেতে হলো, র‍্যাফ নামানো হলো অথচ দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতে এর কিছুই প্রকাশিত হলো না। বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমগুলিও ছিল তিন বাঁদরের মতো— "কিছু দেখিনি, কিছু শুনিনি, কিছু জানি না।" আর মুসলমানদের চরণামৃত পান করা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবীরা মৌনীবাবা সেজেছিলেন। সবকিছু ঘটে যাওয়ার পর প্রশাসনিক তৎপরতায় অবস্থা যখন কিছুটা শান্ত তখন ওইসব রাজনীতিক এবং বুদ্ধিজীবীরা শান্তি মিছিল করলেন, শান্তি বৈঠক করলেন, ওইসব অঞ্চলে শান্তি বজায় রাখার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু দুষ্কৃতীদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার কোনও দাবী করলেন না, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে সেজন্য প্রশাসনের কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বললেন না। অথচ এঁরাই নন্দীগ্রাম, খেজুরি, জঙ্গলমহল, লালগড় প্রভৃতি অঞ্চলে সিপিএম-এর হার্মাদ বাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন। ওই সমস্ত হার্মাদদের উপযুক্ত শাস্তির দাবীতে সোচ্চার হয়েছিলেন। অথচ দেগঙ্গার ঘটনায় সবাই বোবা, কানা বনে গেলেন। সন্দেহ হয় এরা কি সত্যিই বুদ্ধিজীবী না দুষ্ট বুদ্ধিজীবী? রাজনৈতিক নেতাদের জোটবদ্ধ মুসলিম ভোটের লালসা থাকতে পারে আর এদের লালসা কি পেট্রো-ডলার? সন্দেহটা অস্বাভাবিক নয়। এরা রিজওয়ানুর রহমানের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকাহত হন, মৌন মিছিল করেন, কালো ব্যাজ পরেন, অথচ দেগঙ্গার ঘটনায় এতটুকু বিচলিত হন না। এদের সাবধান করে দিতে চাই কনৌজ অধিপতি জয়চাঁদ, মহম্মদ ঘোরীকে সাহায্য করেছিলেন পৃথ্বীরাজকে ধ্বংস করতে। সেই মহম্মদ ঘোরীই প্রথম সুযোগে জয়চাঁদকে খতম্ করেছিল। দেগঙ্গার ঘটনাবলী গঙ্গার তীরে ঘটতে খুব বেশী সময় নেবে না। পশ্চিমবঙ্গে প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিবর্তন হয়ত ঘটবে। তবে তখন অবস্থা হবে আরও ভয়ংকর, আরও বীভৎস।

—শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দননগর, হুগলী।

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী

একটি দৈনিক সংবাদপত্রে (বর্তমান ৭।১০।১০) দেখলাম সোনিয়া পুত্র রাহুল গান্ধী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ ও নিষিদ্ধ ঘোষিত সিমিকে ছত্রচত্তচগ্ন একই পংক্তিতে ফেলেছেন। তিনি আর এস এস ও সিমিকে মৌলবাদী সংগঠন রূপে চিহ্নিত করেছেন। আসলে এই অচিন্ত্যনীয় প্রতিক্রিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। ইত্যালির ইতিহাস তাঁর জ্ঞাত হলেও ভারতবর্ষের ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। আর কথায় বলে, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। তাই ভারত সম্পর্কে অল্প জ্ঞানার্জন করেই একটা সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের সাধারণ সম্পাদক হয়ে যান। এদেশের নাকি ভাবী প্রধানমন্ত্রী তিনি! তাহলে তো দেশের পক্ষে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে। এহেন একজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসানো জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নয় কি? জাতীয় স্বার্থরক্ষাকারী রাষ্ট্রবাদী সংগঠন আর এস এস। সে সম্পর্কে সম্যক ধারণাই নেই রাহুল গান্ধীর। এহেন সংগঠনকে সিমির সঙ্গে তুলনা করা অপরিপক্ক ও অপরিণত মস্তিষ্কের প্রতিফলন বললেও অত্যুক্তি হয় না। আসলে রাজনীতিতে নবাগত রাহুল গান্ধী সর্বভারতীয় একটা পদে আসীন হয়ে যেন হাতে মোয়া পেয়ে গেছেন। তাই দেশের যত্র-তত্র ভ্রমণ করে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নানা কটূক্তি করে চলেছেন বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে। এঘটনা অকালপক্কতার সঙ্গেই তুলনীয়। আসলে মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেসের গান্ধী পরিবারের সদস্যদের কান্ডারী করে সংগঠন বাঁচিয়ে রাখার রীতি নতুন কিছু নয়। এই রীতি অনুসারে নবতম সংযোজন হলো রাহুল গান্ধী।

কিন্তু ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সঙ্ঘের ভূমিকার কথা কতটুকু জানা আছে রাহুল গান্ধীর? দেশকে পরমবৈভবশালী করার লক্ষ্যে সঙ্ঘের অগ্রণী ভূমিকার কথা কি নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে? সঙ্ঘের আদর্শ হলো নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র জাতিকে জাতীয় চরিত্র ও সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ করা, দেশপ্রেমিক ও অনুশাসন সম্পন্ন সমাজ গঠন করা। এহেন সংগঠনকে নিষিদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন সিমির সঙ্গে তুলনা করা জাতীয় স্বার্থ বিরোধী মন্তব্যের সঙ্গেই তুলনীয়। তাই সঙ্ঘের আদর্শ ও মূল্যবোধগুলো রাহুল গান্ধীর কাছে শিক্ষণীয় বিষয় নয় কি?

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

কাদের 'মাদার'?

অতি সম্প্রতি টেরেসার জন্মশতবার্ষিকী পালিত হলো। সেই উপলক্ষে প্রকাশিত হলো স্মারক মুদ্রার। এছাড়াও রেলমন্ত্রক ব্যবস্থা করল একটি স্পেশাল রেলের। সকলে 'মাদার'-এর নামে প্রায় মূর্ছাগত। মিডিয়াও তাকে নিয়ে উদ্বেল, তাঁকে দয়ার অবতার হিসাবে তুলে ধরার জন্য, দরিদ্র মানুষের প্রতি তাঁর অপার করুণা প্রদর্শনের জন্য বহু কলমচি প্রাণওষ্ঠাগত করে ফেললেন। কিন্তু কেউ একবারও উন্মোচিত করলেন না তার সেবার আড়ালে হিন্দু-সমাজকে ধর্মান্তরিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তকে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে 'টেরেসাবেশী' যে সমস্ত নানদের দেখা যায় তাদের কেউই বিদেশিনী নন বরং হিন্দু-সমাজেই এসে যারা 'মাদারের' স্নেহাশীষ পেয়ে ধর্মান্তরিত হয়েছেন এবং বর্তমানে চার্চের নির্দেশে আরও হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় রত।

অথচ বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অন্যান্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দুটি সংস্থা নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে সেই 'রামকৃষ্ণ মিশন' ও ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের ভূমিকার কথা স্বীকার করার প্রয়োজনও মনে করেন না এই মাদার বন্দনারত ভক্তেরা। আর 'রেডি ফর সেল্ফলেশ সার্ভিস' দেনেবালা আর এস এসের সেবা বা বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সেবাকাজের কথা স্বীকার করাও তাদের কাছে সাম্প্রদায়িকতা। তাই ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষের জন্য সেবার অবতার হিসাবে একমাত্র 'টেরেসা'কেই তুলে ধরতে চাইছেন' আমাদের মিডিয়া ও সরকার।

প্রকৃতপক্ষে সঙ্ঘের বিপক্ষে অতীতে গান্ধীহত্যার কলঙ্ক, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভ্রষ্টকারীর তকমা এবং বর্তমানে গেরুয়া সন্ত্রাসের মিথ্যা প্রসঙ্গ যেভাবে আলোচনা করা হচ্ছে তার এক শতাংশও যদি সঙ্ঘ পরিচালিত সেবাকাজগুলির সম্পর্কে করা হতো তাহলে সঙ্ঘের সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কংগ্রেস ও মিডিয়া তাই ভারতবর্ষে সেবার অবতার হিসাবে টেরেসাকে তুলে ধরতে তৎপর। কিন্তু কেউ প্রশ্ন করেন না ধর্মান্তরকরণের কাণ্ডারী কেন 'মাদার'?

—রাজু হালদার, জামালপুর, বর্ধমান।

হার্মাদ উৎসব

দুর্গোৎসবের কয়টাদিন বেশ শান্তিতেই ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষ; কিন্তু বিজয়া দশমীর পরের দিন থেকেই আবার শুরু হয়েছে হার্মাদ উৎসব। এই উৎসবের কর্মকর্তাদের মধ্যে আছেন সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেসের বড় বড় সব রথী মহারথীগণ।

বিজয়া দশমীর পরের দিন হার্মাদ উৎসবের সূচনা হয় সল্টলেকের ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কুলিপাড়ায়। সেখানে সিপিএম তৃণমূল কংগ্রেসের মারামারিতে হতাহত হয় বেশ কিছু সাধারণ মানুষ। এদের মধ্যে ৯ বছরের এক কিশোরীও আছে। বোমা গুলির আওয়াজে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এক বৃদ্ধ। কলকাতার এক প্রান্তে হার্মাদ উৎসবে যে ভাবে গুলিবৃষ্টি হয়েছে, তা দেখে পুলিশ প্রশাসনও বিস্মিত। হার্মাদ উৎসবের জন্য বেআইনি অস্ত্র কি ভাবে পশ্চিমবঙ্গকে গ্রাস করেছে, এই ঘটনায় তা আবার স্পষ্ট হয়ে গেলো। পরিস্থিতি সামাল দিতে বুদ্ধ ব্যূহে আবদ্ধ পুলিশ প্রশাসন যে কত অসহায়, সল্টলেকের হার্মাদ উৎসব সাধারণ মানুষকে তা আবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

দুর্গোৎসবের পরে হার্মাদ উৎসব শুধু সল্টলেকের সীমারেখাতেই আবদ্ধ ছিল না। এই উৎসব চলেছে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে। যেমন হুগলী জেলার খানাকুলে। সেখানেও সি পি এম তৃণমূল হার্মাদ উৎসব বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছিল। সেখানেও গুলিবিদ্ধ হয় বেশ কিছু লোক। বর্ধমান জেলার কালনার হাঁসপুকুরেও বোমা, গুলিতে জখম হয় অনেক মানুষ। এইসব ঘটনায় বিভিন্ন স্থানে বাড়ীঘর ও ভাংচুর করে আনন্দিত হয় হার্মাদ বাহিনী।

বাংলার সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন বুদ্ধদেব, মমতা মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের পবিত্র ঈদ উৎসব নিয়ে যেভাবে মেতে উঠেছিলেন, হিন্দু সম্প্রদায়ের পবিত্র শারদ উৎসব নিয়েও সেভাবে মেতে উঠবেন; কিন্তু ফল হলো বিপরীত। তারা দুর্গাপূজার কয়দিন চুপচাপ থেকে আবার শুরু করে দিয়েছে তাদের বারোমেসে হার্মাদ উৎসব। যার ফলে বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

লোভ

(৯ পাতার পর)

সাহায্য করুম— তোমার দুলাভাইরে খুঁইজ্যা দিমু।"

ওরা খেয়ে উঠতেই তহিদুল মিঞা জামিরকে বলে, আগে ভিডিও হলে চলো। সেখানে এখন দ্বিতীয় শো চলছে। তলিদুল মিঞা ভিডিও হলে গিয়ে গেটকীপারকে বলে,—"মনসুর, তুমি ফার্স্ট শোয়ে একজন লোকরে হল ভাঙবার আগে বাইরিতে দেইখ্‌ছ।" জামির পাশ থেকে তার দুলাভাই-এর শরীরের বর্ণনা দেয়। গেটকীপার মনসুর বলে,— "জী, লোকডারে খোঁজ করবার আইছিল, হাসান মোল্লার মেয়া নগমা। হ্যাসে লোকডা নগমার লগেই যায়গা। তারপর আর আহে নাই।"

তহিদুল মিঞা জামিরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে,—"কী হে জামির, তোমার দুলাভাই তোমার বহিনের লগে বাড়ী গ্যাছে, আর তুমি খামোকা লোকডারে খুইজ্যা বেড়াইতাছ। যাওগা— বাড়ীতে গিয়াই তারে পাইবা।" জামির এতক্ষণ পরে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। কীভাবনাটাই না ভেবেছিল সে। জামির আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ীর রাস্তা ধরে। বাড়ীর দোরগোড়ায় আসতে না আসতেই বৃষ্টিটাও জাঁকিয়ে নামে। জামির কোনওমতে দৌড়ে গিয়ে বৈঠকখানায় ওঠে। ঘরের ভিতরটায় জমাট অন্ধকার, বাইরে অঝোরে বৃষ্টি। হাত তাড়িয়ে— কোনওমতে গিয়ে বিছানায় বসে। দুলাভাই কাশেম-কে বিছানায় না পেয়ে একটু চিন্তা যে হয়নি তা নয়। কিন্তু পরক্ষণেই ভেবে নেয় বৃষ্টির জন্য বোধহয় শোবার ঘরে আটকে গেছে। বৃষ্টির জন্য সেও শোয়ার ঘরে গিয়ে খোঁজ নিতে পারে না। অপেক্ষা করে থাকে বৃষ্টিটা ধরা পর্যন্ত। কিন্তু বৃষ্টি আর ধরে না। সমানে ঝরতেই থাকে। জামির বিছানায় বসে থাকতে থাকতেই একসময় শুয়ে পড়ে। গায়ে ঠান্ডা মালুম হয়, বিছানার চাদরটা তুলে নিয়ে গায়ে চাপিয়ে দেয়। অচিরেই তার ক্লান্ত শরীরটা ঘুমে ডুবে যায়।

রাত তখন গভীর। বৃষ্টি পুরোপুরি ধরে না গেলেও তীব্রতা অনেকটাই কমে গেছে। সামনে হাসান মোল্লা, পিছনে বড় ছেলে আমির। বৈঠকখানার দরজায় এসে দরজাটা খুলতে যায়, কিন্তু হাসান গায়ে জড়ানো চাদরটা থেকে হাতটা বার করেই বুঝতে পারে দরজাটা হাট করে খোলা। ভাবে ভালোই হলো, দরজা খোলার ঝামেলা আর করতে হলো না। নিজের ঘর ভালোভাবেই জানা আছে, বিছানাটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে পাতা। মাথাটা দরজার উল্টোদিকে পশ্চিম দিকেই। বৃষ্টিতে চাদর জড়ানো মাথাটা বাঁ হাতে চেপে ধরে ডান হাতে শক্ত করে ধরা হাঁসুয়াটা গলায় একবার জোর করে চেপে ধরেই টেনে নেয়। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত উঠে হাসান-মোল্লার মুখচোখ ভিজিয়ে দেয়। শরীরটা একবার জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে। কিন্তু উঠতে পারে না। পাদুটো বড় ছেলে আমির সজোরে চেপে আছে। খানিক পরে শরীরটা নিথর হয়ে পড়তেই আমির অস্ফুট স্বরে বলে ওঠে— "আব্বু"! হাসান মোল্লা তেমনি চাপা কিন্তু রাগতস্বরে বলে, "কীরে শালা! টাকাডা কোন্‌হানে আছে আগে খুঁইজ্যা দ্যাখ্।"

হাসান মোল্লা ওইরকমই বলে, বেটাকে শালা আর শালকে বেটা— এটা হলো তার চরম বিরক্তির প্রকাশ। "জী-আব্বু, এইডা তো জামির, অর ডান পায়ে ছয়ডা আঙুল।" জামিরের ডান পায়ে যে ছয়টা আঙুল তা হাসান মোল্লাও জানে, আর এও জানে যে তার পরিবার পরিজনের মধ্যে কেবল ছোট ছেলে জামিরের ডান পায়েই ছয়টা আঙুল।

হাসান মোল্লার ডান হাতটা তখনও হাঁসুয়া দিয়ে গলাটা চেপে ধরে আছে। আমিরের মর্মভেদী অস্ফুট চিৎকার— 'ভাইরে জামির'। মোল্লা হাসান যেন বিদ্যুৎপৃষ্ট, হাত থেকে হাঁসুয়াটা সহসা খসে পড়ে। রক্তমাখা হাত দিয়ে ট্যাঁক থেকে দেশলাই বার করে জ্বালে। দেশলাইয়ের অস্পষ্ট আলো জামিরের নিথর মুখে পড়তেই মোল্লা হাসান "ইয়া আল্লাহ্" বলে দু'হাতে নিজের মুখটা চেপে ধরে মাটিতে ধপ্ করে বসে পড়ে।

ঘরের বাইরে তখনও অঝোরে বৃষ্টি ঝরে চলেছে। আর ঘরের ভিতরে শোকবিহ্বল পিতা-পুত্র। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেন নিজেদেরই ভর্ৎসনা করছে। অন্যদিকে আসন্ন বিপদ তাড়া দেয়। আমির বলে— "আব্বু তাড়াতাড়ি করেন, রাইত শেষ হইয়াতে, লাশ লুকানের লাগবো।" মোল্লা হাসানের হুঁস আসে, তাইতো। লাশটা বিছানার চাদর দিয়ে মুড়ে নিয়ে কাঁধে তুলে নেয়। আমির ছোটে গোয়াল ঘরের দিকে, কোদাল আনতে। হাসান মোল্লা জামিরের লাশ এসে নামায় একটা গাছতলায়। প্রায় সাথে সাথে আমিরও পৌঁছে যায় কোদাল নিয়ে। তাড়াতাড়ি পিতাপুত্র গাছতলায় একটা গর্ত করে লাশটা কবর দিয়ে দেয়। এদিক সেদিক তাকানোর সময় কোথায়, এখনও যে বৈঠকখানার বিছানা থেকে রক্তের দাগ মোছা বাকি। পূর্ব-আকাশটা বোধহয় ফর্সা হয়ে আসে। কিন্তু আল্লাহর কি কুদরৎ। মানুষ যা প্রকাশ করতে গলদঘর্ম হয়ে সাত কাহন কথা দিয়ে গল্প ফাঁদে, আল্লাহ্ তা সহজ সাবলীল বাস্তবে ঘটিয়ে থাকেন। মানুষ যেখানে অপরাধ করে 'ট্র্যাজেডি' ঘটায়, আল্লাহ সেখানে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করে 'কমেডি' ঘটায়। নইলে এমনটি হবে কেন—যে গাছের তলায় হাসান মোল্লা জামিরের লাশকে লুকিয়ে রাখতে রাতের অন্ধকারে এত সচেষ্ট, সেই গাছেরই উপরে কাশেম বসে বসে লাশ লুকানোর আদ্যোপান্ত ঘটনার চোখে দেখা সাক্ষী হয়ে থাকে।

লাশ পুঁতে ফেলে হাসান মোল্লা ও আমির তাড়াতাড়ি বৈঠকখানায় এসে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে যতদূর দেখা সম্ভব বিছানা ও মেঝে থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলে। অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দেয়।

অন্যদিকে কাশেম পূব আকাশ ফর্সা হতেই গাছ থেকে নেমে সোজা পড়িমরি করে থানায় গিয়ে হাজির হয়।

ভিন্ন রূপে ভিন্ন নামে মা কালী

সংকর্ষণ মাইতি।। বিবসনা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজ, গলায় মুণ্ডমালা শোভিত ভয়ালরূপ কালীমায়ের প্রতিমা দেখতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু প্রকৃতি অনুযায়ী ভিন্নরূপে, ভিন্ননামে বিভিন্ন কালীর পরিচয় পাওয়া যায়। তোড়ল তন্ত্র মতে কালী আট প্রকার। দক্ষিণাকালী, সিদ্ধ কালী, গুহ্যকালী,

পরম্পরা

মহাকালী, ভদ্রকালী, চামুণ্ডাকালী, শ্মশানকালী এবং শ্রীকালী।

দক্ষিণা কালী

দশমহাবিদ্যার প্রথম বিদ্যা যে কালী, তিনি হলেন দক্ষিণা কালী। চতুর্ভুজা, এলোকেশী, বিবসনা, শ্যামবর্ণা। শ্যামবর্ণা রূপটি এসেছে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে। মনে হয় আগমবাগীশের মূর্তি-প্রবর্তনের পর। বহু দশমহাবিদ্যার পূজানুষ্ঠানে প্রথম বিদ্যা কালীর গায়ের রঙ কালো কিংবা গাঢ় মেঘের মতো রঙ হতে দেখা গেছে।...এঁর পুজো করলে মুক্তি-ফল পাওয়া যায়। গৃহস্থের মঙ্গল কামনায় এঁর পুজো।

সিদ্ধ কালী

সিদ্ধ কালী দ্বিভুজা। ডান হাতে খড়্গ, বাম হাতে কপাল পাত্র, দু'পায়ের বাম পা-নীচে শায়িত শিবের বুকের ওপর, ডান পা নিজের দুই উরুর মধ্যে স্থাপিত। কপাল পাত্রে থাকা অমৃত পানে রতা সিদ্ধ কালী। সাধারণতঃ সিদ্ধ-সাধকের ধ্যানে ইনি প্রকটা হন।

গুহ্যকালী

ভয়ানক চেহারার এই গুহ্য কালী। গাঢ় মেঘের মতো গায়ের রঙ। লোল জিহ্বা। কোমরে সামান্য বস্ত্র। কাঁধে সাপের যজ্ঞোপবীত। গুহ্যকালী মড়ার কাঁচা মাংস খেতে ভালোবাসেন। ভাবুন একবার! মুর্শিদাবাদ বীরভূম সীমান্তে অকালী গ্রামে মহারাজ নন্দকুমার প্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালীর মন্দির রয়েছে। দেবী ভয়ঙ্করী হলে কী হবে ভক্তিভরে যিনি মনেপ্রাণে তাঁর স্মরণ নেন তাঁকে সাহসী করে তোলেন দেবী।

মহাকালী

মহাকালী দশভূজা। দশভূজে রয়েছে খড়্গ, বাণ, শূল, শঙ্খ, চক্র, ধনু ভুশুণ্ডি (আগ্নেয়াস্ত্র বিশেষ), পরিঘ, রুধিরা ও নরমুণ্ড। দেবী পঞ্চ দশ নয়না। সপ্তসতী চণ্ডীতে কিন্তু উল্লেখ ত্রিংশল্লোচনা। ইনি ভক্তকে রূপ, সৌভাগ্য, কান্তি ও শ্রী প্রদান করেন।

ভদ্রকালী

ভদ্র শব্দের অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, সৌভাগ্য। কাল অর্থে শেষ সময়। মরণ, মৃত্যু। এখানে কাল অর্থে শেষ সময়—মৃত্যুপথ যাত্রার সময়। মরণকালে যিনি জীবের মঙ্গল কামনা করেন তিনি ভদ্রকালী। একটা গানের কলিতে রয়েছে—'পাতালেতে ছিলে মাগো হয়ে ভদ্রকালী'...। মহীরাবণ কি এই ভদ্রকালীর উপাসক? হয়তো হবে। দেবীর অতসী ফুলের মতো গায়ের রঙ, মাথায় জটাজুট, কপালে অর্ধচন্দ্র এবং গলায় কণ্ঠহার। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করার সময় উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী ও দুর্গার রূপ পরিগ্রহ করেন। শাস্ত্রে মন্ত্রোচ্চারণে 'ভদ্রকালী' নামটি উচ্চারিত। দক্ষযজ্ঞ বিনাশকালে, মহিষাসুরের নিধনকালে মায় সরস্বতী পুজোর মন্ত্রে ভদ্রকালীর নামোল্লেখ রয়েছে। দেখা যাচ্ছে, দুর্গা ও সরস্বতী ভদ্রকালী রূপেও পূজিতা।

চামুণ্ডা কালী

মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত—চণ্ড মুণ্ড দুই অসুরের বধের নিমিত্ত দেবী ভগবতী দুর্গার কপাল থেকে চামুণ্ডা কালীর উৎপত্তি। গায়ের রঙ ঘননীল পদ্মের মতো, হাতে অস্ত্র, পরণে বাঘছাল, বিরাট দন্তরাজি। দুর্গাপুজোয় চামুণ্ডা কালীর পুজো হয় সন্ধি পুজোর সময়। চণ্ড মুণ্ডকে বধ করতেই দেবী দুর্গা এই কালীর নাম দেন চামুণ্ডা। 'চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবী ভবিষ্যসি'। অশুভ শক্তির বিনাশের জন্য চামুণ্ডা কালীর পুজো হয়।

শ্মশান কালী

যাঁরা শব সাধনা করেন তাঁদের কাছে শ্মশান কালী আরাধ্যা দেবী। শব সাধনার মধ্য দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। শ্মশান কালীর গায়ের রঙ গাঢ় কালো, রক্তাবর্ণা চোখ, দুটি হাত। এক হাতে মদ্যপাত্র, অপর হাতে কাঁচা মাংস। উলঙ্গিনী হয়ে কাঁচা মাংস চিবিয়ে খাচ্ছেন, কষ বেয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে। পায়ের নীচে শব-শিবা। এই হলো শ্মশান কালীর মূর্তি। গ্রামেগঞ্জে শ্মশানের ওপর বা পাশে শ্মশান কালীর পুজো হয়। বলির ব্যবস্থা আছে। আখ কুমড়ো প্রভৃতি। কোথাও বা ছাগ। ডাকাতরা আগে নাকি শ্মশান কালীর সামনে নরবলি দিয়ে ডাকাতি করতে বেরোত। এখন নরবলির কথা শোনা যায় না। এখন তো আধুনিক ডাকাতির চিন্তাভাবনা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। শ্মশান কালীকে স্মরণ করে ডাকাতি করতে যায় কিনা বলা যাচ্ছে না।

শ্রীকালী

দারুক নামে অসুরকে বিনাশ করে দারুকাসুর নামে অভিহিত শ্রীকালী। জানা যায়, শিবের শরীরে প্রবেশ করে শিবের কণ্ঠের গরল শোষণ করে নিজেই কৃষ্ণবর্ণা হয়েছেন। এক হাতে সাপ অন্য হাতে ত্রিশূল।

দক্ষিণবঙ্গের বহু জায়গায় গ্রাম্য বার্ষিক পুজো কিংবা পারিবারিক মানসিক কালী পুজোয় সাধারণত 'রক্ষাকালীর' পুজো করা হয়। গায়ের রঙ কালো, বাম হাতে মদের পূর্ণ পাত্র, ডান হাতে মানুষের ছোট্ট প্রতিকৃতি। উলঙ্গিনী। গলা থেকে চওড়াযুক্ত বেশ বড় ধরনের গহনা কোমর ছাড়িয়ে সামনে ঝুলছে। লজ্জা-নিবারিণী গহনা বলা যেতে পারে। কোথাও আবার গহনাটির পাশে মানুষের মুণ্ডমালা, বেশ নীচ পর্যন্ত ঝোলা। দুটি পা শিবের বুকে ও পায়ের ওপর। ত্রিনয়নী তো বটেই, তবে নাকে বৈষ্ণবীদের মতো রসকলি। নাকে রসকলি থাকলে কী হবে রক্ষাকালীর সামনে ছাগ মেষ বলির ব্যবস্থা অনেক জায়গায়। দেবীর লোল জিহ্বা দেখা যায়নি। পরিবর্তে দেঁতো-হাসি। সাধারণত খরা বন্যা বিশেষ করে গ্রামেগঞ্জে মহামারী যাতে না হয় তার জন্য বার্ষিক 'রক্ষাকালী'র পুজো করা হয়। তামসিক পুজো, রক্ষাকালী পুজো সাধারত কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষের চতুর্দশী তিথি ধরে অনুষ্ঠিত হয়।

উপরিউক্ত কালী ছাড়া অজস্র কালীর নাম পাওয়া যায়। এর মধ্যে শ্যামা কালীর নাম উল্লেখযোগ্য। কার্তিকী অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলির সময় এই পুজো। পুজোর মূর্তি ও পুজোর পদ্ধতি প্রকরণের প্রবর্তক নবদ্বীপের কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। আবার কালী ও গোপাল (কৃষ্ণ) যে এক তা তিনি তাঁর কৃতকর্মের মাধ্যমে জেনে ছিলেন একদিন।

কৃষ্ণানন্দের বাবা মহেশ্বর গৌড় দেশ থেকে এসে নবদ্বীপে বসবাস করেন। দুই ছেলে। কৃষ্ণানন্দ ও মাধবানন্দ। কৃষ্ণানন্দ 'আগমবাগীশ' এবং মাধবানন্দ 'সহস্রাক্ষ' উপাধিতে ভূষিত হন। কৃষ্ণানন্দ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং সহাধ্যায়ী ছিলেন। কাব্যাদি পাঠ শেষ করে বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। অথচ বাড়িতে কুলদেবতা 'গোপাল'। ভাই মাধবানন্দ গোপালের উপাসক। বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মকে কেন্দ্র করে উভয়ের বিরোধ।...বাড়ির বাগানে একটি কলার কান্দি ছিল। উভয়ের ইচ্ছে ছিল নিজ নিজ ইষ্টদেবদেবীকে কলা নিবেদন করবেন। কলার কান্দিটি নেই। সন্দেহ দানা বাঁধে। নিশ্চয়ই ভাই মাধবানন্দ তার ইষ্টদেবতা গোপালকে কলা নিবেদন করেছে। রাগে ঠিক করে ফেললেন, ভাইকে মেরে ফেলবেন। অনেক খোঁজার পর 'গোপালের' ঘরের দিকে গেলেন তিনি। ডাক হাঁক করলেন। সাড়া নেই। বুঝলেন, ভাই গোপালের ঘরে লুকিয়ে আছে। দোরের ফাঁক দিয়ে দেখেন, কালিকা দেবী গোপালকে কোলে করে নিজে কলা খাচ্ছেন এবং গোপালকে খাওয়াচ্ছেন। দৃশ্যটি দেখে কৃষ্ণানন্দ স্তম্ভিত। সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, যিনি গোপাল তিনিই কালিকা (কৃষ্ণ ও কালী)। দুই-ই অভিন্ন। ভেদাভেদ জ্ঞান করা বিড়ম্বনা মাত্র। কৃষ্ণানন্দ খুব খুশি। ভাই-এর প্রতি রাগ একেবারে নেই তাঁর।

রাসবাড়ি ঠাকুরবাড়ি

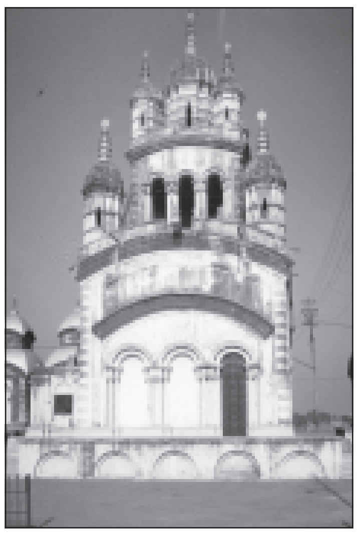

রাধারমণজীউর 'নবরত্ন' রাসবাড়ি।

প্রণব রায়।। হাওড়ায় বেলুড় আসার পথে রাসবাড়ি একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এটি গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী একটি ঠাকুরবাড়ি। কার্তিক মাসের রাসপূর্ণিমায় এখানে একটি বড় মেলা বসে। একমাস ধরে এই মেলা চলে। বালির 'বিবেকানন্দ সেতু'র কিছুটা দক্ষিণে 'রাসবাড়ি' অবস্থিত। রাসবাড়ির মন্দিরগুলি হোল ঃ ১. রাধারমণ জীউর 'নবরত্ন' ও সামনে নাটমন্দির, ২. দশটি খোলা দ্বার ও অনেকগুলি চূড়াসহ গোলাকৃতি রাসমঞ্চ, ৩. ছ'টি 'আটচালা'-রীতির শিবমন্দির, ৪. গঙ্গার ধারে থামওয়ালা একটি ঘড়িযুক্ত তোরণ। মন্দিরগুলি সবই ইঁটের তৈরি। রাধারমণের দক্ষিণমুখী 'নবরত্ন' মন্দির খুবই দর্শনীয়। এর উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হলো, নিচের 'দালান'-এর ওপর 'দালান'টির চেয়ে খুবই ছোট। দুটিরই ত্রিখিলান প্রবেশ পথ আছে। ঠিকভাবে দেখলে মনে হবে, দ্বিতলে ছাদের ওপর যেন একটি ছোট 'পঞ্চ রত্ন' বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরে কোথাও কোনও 'টেরাকোটা' অলংকরণ নেই। অবশ্য, কোনও না কোনও সময় সংস্কার কাজ যে হয়েছিল, তা বোঝা যায়। গঙ্গার পশ্চিম তীরে এমন একটি সুদৃশ্য উচ্চ মন্দির বিরল। মন্দিরের 'রত্ন'গুলিও সুঠাম সুন্দর।

মন্দিরের গায়ে প্রতিষ্ঠাকাল লেখা না থাকলেও মারবেল পাথরের প্রশস্ত সিঁড়ির একস্থানে একটি লেখা থেকে জানা যায় কাদম্বিনী দাসী ও পূর্ণচন্দ্র দাঁ ১২৯৭ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ (১৮৯০ খ্রিঃ মে-জুন) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই ন'চুড়োর মন্দিরের উত্তরপাশে 'রাসমঞ্চ' এবং এর পূর্বদিকে তিনটি 'আটচালা' মন্দির। দক্ষিণদিকে নাটমন্দিরের পাশে আরও তিনটি 'আটচালা' মন্দির। জানা যায়, পূর্ণচন্দ্র দাঁয়ের শালকিয়ার হরগঞ্জ বাজারের আয়ে এই ঠাকুরবাড়ির খরচ চলত।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

বেলুড়মঠ রাসবাড়ি থেকে খুব একটা বেশি দূরে নয়। প্রসিদ্ধ বেলুড়মঠ শ্রীরামকৃষ্ণমন্দির বাংলায় প্রচলিত নির্দিষ্ট কোনও মন্দির স্থাপত্যশৈলীর মধ্যে পড়ে না। স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পরে ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি তাঁর গুরুভাই স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এই মন্দির উৎসর্গ করেন। স্বামীজির ইচ্ছা ছিল, তাঁর পরিকল্পিত স্থাপত্যে তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের স্থাপত্যকলার এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটাবেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (যিনি একজন ইঞ্জিনিয়ারও ছিলেন) ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ১৬ জুলাই স্নানযাত্রার দিন বর্তমান মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বর্তমান মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ অনুসারে সর্বধর্মসমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এই মঠের স্থাপত্যকর্মের তিনটি অংশ লক্ষ করা যায়— ১. দক্ষিণমুখী উচ্চ প্রবেশমণ্ডপ, ২. হলঘর বা সাধারণ উপাসনাস্থল এবং ৩. গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিকশিত পদ্মের ওপর ধ্যানমগ্ন আসীন মূর্তি স্থাপিত। ছাদের ওপর ও শীর্ষভাগে 'চালা' ও 'গম্বুজে'র একত্র সমাবেশ ঘটেছে। সামনের প্রবেশমণ্ডপটি যেন দক্ষিণ ভারতের বাংলা 'গোপুরম্'— অবশ্য শুধুমাত্র উচ্চতার দিক থেকে। এখানে ভাস্কর্য কিছুই প্রায় নেই,

(এরপর ১৫ পাতায়)

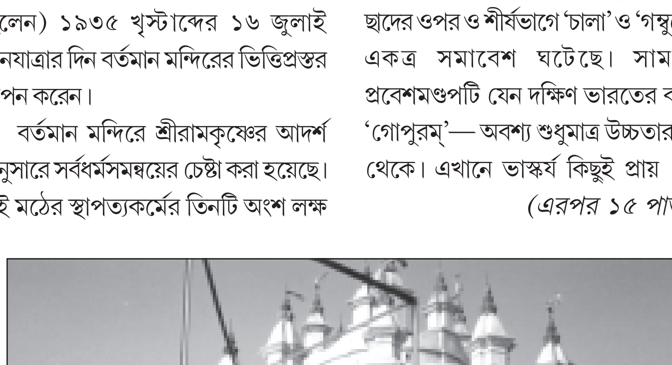

রাধারমণজীউর রাসমঞ্চ রাসবাড়ি।

কর্মযোগ

একমুঠো চাকরির খবর

একমুঠো চাকরি

বিভিন্ন কন্সালটেন্সিতে নাম লিখিয়েও যেসব চাকরিপ্রার্থী মনের মতো চাকরি পাচ্ছেন না, তাঁদের জন্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতায় সরকারি চাকরি এবং আলিয়া উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা পদে বহু চাকরির খবর আছে। অন্য রাজ্যে ছুটতে হবে না। কলকাতা বা রাজ্যেরই কোনও জেলায় নিয়োগ করা হবে। সন্ধান দিচ্ছেন নীল উপাধ্যায়।

মাধ্যমিক যোগ্যতায় সরকারি চাকরি

কলকাতায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান 'অফিস অব্ দ্য প্রিন্সিপ্যাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল' বেশ কিছু কর্মী নিয়োগ করবে।

পদের নাম ঃ মাল্টি টাস্কিং স্টাফ।

শূন্য পদের সংখ্যা ঃ ২৭৫।

শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক।

বয়স ঃ ১০ নভেম্বর, ২০১০-এ ২৭ বছরের মধ্যে।

লিখিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হবে।

ঠিকানা ঃ সিনিয়র অ্যাকাউন্টস্ অফিসার (অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশন, ১, অফিস অব্ দ্য প্রিন্সিপ্যাল অ্যাকাউন্টস জেনারেল (এ অ্যান্ড ই), ওয়েস্ট বেঙ্গল, ট্রেজারি বিল্ডিং, ২ গভর্ণমেন্ট প্লেস (ওয়েস্ট), কল-১।

উচ্চ মাধ্যমিক যোগ্যতায় সরকারি চাকরি

পদের নাম ঃ কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক।

পরীক্ষার নাম ঃ কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন, ২০১১।

পরীক্ষা নেবে পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। প্রার্থী নিয়োগ হবে রাজ্য সরকারের কৃষি দপ্তরের অধীনে।

ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ।

বাংলা বলা, লেখা ও পড়ায় দক্ষতা থাকা চাই। দার্জিলিঙের পার্বত্য এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষেত্রে নেপালি।

বয়স ঃ ১ জানুয়ারি ২০১০ তারিখে ১৮ থেকে ৩৭ মধ্যে। এস্ সি, এস্ টি, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধবসীমায় ছাড়।

আবেদন জানাবার শেষদিন ২৩ নভেম্বর। পরীক্ষা ঃ ২০১১ সালের মে মাস নাগাদ।

পরীক্ষায় থাকবে অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন (পার্ট-১) ও ডেস্ক্রিপটিভ টাইপ প্রশ্ন (পার্ট-২)

বিস্তৃত বিবরণ মিলবে www. pscwb.org.in ওয়েবসাইটে।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

১৮টি পদে ৯৮ জন কর্মী নিয়োগ করবে। পদগুলি হলো জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট-কাম-টাইপিস্ট, জুনিয়র স্টেনো, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, জুনিয়র পিওন, জুনিয়র মালি-প্লাম্বার-বাইন্ডার-ইলেক্ট্রিসিয়ান-ড্রাইভার ইত্যাদি।

(এরপর ১৫ পাতায়)

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর।।

দরবারি কুর্নিশ

মার্কিনিরা তাঁদেরই নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বারাক হুসেন ওবামার কাণ্ডকারখানা দেখে সেই থেকে চটে লাল। কারণ, টোকিওতে জাপানি সম্রাটকে সম্মান জানাতে তিনি কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে মেরুদণ্ডটি প্রায় ৫৫ ডিগ্রি বাঁকিয়ে ফেলেছিলেন। এটি আসলে একটি মুঘল দরবারের মুদ্রা। খোদাকে সিজদা আর বাদশাকে কুর্নিশ— মানুষের আমলনামায় এই দু'টি ঘটনা প্রায় সমগোত্রীয়। দরবারি এই কুর্নিশ-করতব-এ বিচ্যুতি ঘটলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু কে কাকে শাস্তি দেয়!

পাখির গানের পথ

সুইজারল্যান্ডের জনবহুল শহর জুরিখের একটি রাস্তার নাম 'ফাগল-সাঙ্গ স্ট্রাটে', যার অর্থ 'পাখির গানের পথ'। বিভিন্ন গাছপালায় সাজানো রাস্তাটির দু'ধারের প্রতিটি বাড়িতে আছে ছোট ছোট সখের বাগান। সেই পথে যেতে যেতে শোনা যায় শুধু পাখির কলতান আর পাখির ওড়াউড়ির সুরেলা শব্দ। কোনও যান্ত্রিক বা উচ্চগ্রামের শব্দ সেখানে যাতে না প্রবেশ করতে পারে, পরিবেশকে তেমন সুন্দর ও সুচারু করে রাখা হয়েছে।

চুম্বন বিক্রি

অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ল্যাকলান ক্রিস্টি এক অভিনব পেশা গ্রহণ করেছেন। মেলবোর্ন শহরে কুইন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিংয়ের সামনে দাঁড়িয়ে রোজ তিনি চুম্বন বিক্রি করেন। চব্বিশ বছরের ল্যাকলানের ওটাই পুঁজি এবং পণ্য। একটি চুমুর দাম মাত্র এক ডলার। দিনে গড়পড়তা আয় মাত্র পাঁচ থেকে দশ ডলার। ল্যাকলানের দাবি, এ কেবল বেসাতি নয়, এভাবেই তিনি সমাজের মূল্যবোধ এবং আচরণবিধিও পাল্টাতে চান। কিন্তু দুঃখ একটাই, বেশির ভাগ মেয়েই নিজের ওষ্ঠাধরে তাঁর পণ্যটি কিনতে নারাজ— মিষ্টি হেসে গালটি বাড়িয়ে দেয় শুধু।

শ্রাদ্ধ শতবার্ষিক ঠাকুর

'রতন শাঁখা-সিঁদুর পরে সারারাত পোস্টমাস্টারের সেবা করল। তারপর সুস্থ করে তুলে বলল, 'আমায় বিয়ে কর।' না, এটি রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' গল্পের কোনও নিরীক্ষামূলক নবনির্মাণ নয়, স্নাতকস্তরের প্রথম বর্ষের আবশ্যিক বাংলার উত্তরপত্র। শুধু তাই নয়, শহরতলীর এক ইস্কুলে ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে মিলেছে বহু মণিমাণিক্য। যথা— রবীন্দ্রনাথের মায়ের নাম? 'মহাশ্বেতা দেবী'। রবীন্দ্রনাথের একটি নাটকের নাম? 'কমলা দপ্তর' ইত্যাদি ইত্যাদি। আপাতদৃষ্টে অফুরন্ত মজার খোরাক এইসব দৃষ্টান্তের নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর বাস্তব অন্ধকার। সার্ধশতবর্ষের এই লোকারণ্য আর গম্ভীর শ্রদ্ধানিবেদনের মহাধুমধামে প্রচ্ছন্ন অন্ধকারটিকে প্রকট করেছে 'অহর্নিশ' (১৪ বছর সংকলন ২০, বর্ষা/খরা ১৪১৭) ছোটপত্র।

।। চিত্রকথা ।। পরশুরাম ।। ১৩

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

শিক্ষক ঃ সবাই কী সুন্দর জঙ্গলের ছবি এঁকেছে, তোর খাতাটা সাদা কেন?

ছাত্র ঃ স্যার ওখানে আগে জঙ্গল ছিল, এখন মরুভূমি হয়ে গেছে।

* * *

রোগী ঃ আমার সব চুল উঠে যাচ্ছে ডাক্তারবাবু। কী করে রাখা যায়?

ডাক্তার ঃ কেন আপনার বাড়িতে কি কোনও খালি বাক্স নেই!

* * *

—বাজ পড়ে সান্টা মারা যাবার পরও তাঁর মুখে হাসি দেখে ভগবান জিজ্ঞেস করলেন, 'মরে গিয়ে তুমি হাসছ যে?'

—মনে হচ্ছে কেউ আমার ফটো তুলছে।

* * *

শিক্ষক ঃ বাবার কাছে ১০ টাকা আছে, তুমি ছ'টাকা চাইলে। কত পড়ে রইল?

ছাত্র ঃ দশ টাকা!

* * *

শিক্ষক ঃ অঙ্ক কিছুই শেখনি।

ছাত্র ঃ আপনি আমার বাবাকে জানেন না, স্যর!

* * *

ভাই ঃ আকাশটা এত উঁচু কেন রে দিদি?

দিদি ঃ বড় বড় বাড়িগুলো যাতে আকাশে ঠেকে না যায় তাই।

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার আগে অযোধ্যার শেষ নবাব কে ছিলেন?

২। পুরাণ মতে মূলত কোন্ বিষয়ের জন্য অক্ষয় তৃতীয়ার তিথি বিখ্যাত?

৩। লেখাটা আমার বড়োগিন্নি, ছবি হলো আমার ছোটগিন্নি— একটু তোয়াজ করলেই সে ভালো, কিন্তু আমার মেজোগিন্নি আমার গান। এই উক্তিটি কার?

৪। একই মাঠে দশ-দশটি টেস্ট শতরান করে ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভাঙলেন কে?— সনৎ জয়সূর্য/বীরেন্দ্র সহবাগ/ কুমার সাঙ্গাকারা।

৫। কোন্ দু'টি সাহিত্যকর্মের জন্য মহাশ্বেতা দেবী ১৯৭৯ ও ১৯৯৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান?

—নীলাদ্রি

উত্তর ঃ

১। ওয়াজির আলি শাহ্

২। ওই দিন থেকে সত্যযুগের শুরু

৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

৪। কুমার সাঙ্গাকারা

৫। অরণ্যের অধিকার ও হাজার চুরাশির মা

প্রাক্তন বিদ্যার্থী পুনর্মিলন উৎসব

বক্তব্যরত বিজয়গণেশ কুলকার্ণী।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ 'শিশু মন্দিরের শিক্ষা হলো পরিপূর্ণ শিক্ষা। সম্পূর্ণ বিকাশের শিক্ষা। যা অন্যত্র দেখা যায় না। শিশু মন্দির থেকে শিক্ষালাভের পর ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে আচরণ ও কাজের মাধ্যমে দেশ, সমাজ ও পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করতে হবে। শিশু মন্দিরের আচার্য-আচার্যা এবং অন্যান্যরা প্রাক্তন ছাত্রদের কাছ থেকে এরকমই প্রত্যাশা করেন। সকলের কাছ থেকে জয়লাভের আশা করলেও শিষ্য ও পুত্রের কাছ থেকে পরাজয় কামনা করা এদেশের ঐতিহ্য।'

উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন 'বিদ্যাভারতী' অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থার সর্বভারতীয় 'সংস্কৃতি জ্ঞান পরীক্ষা' এবং 'সংস্কৃত' বিষয় প্রমুখ বিজয় গণেশ কুলকার্ণী। গত ১৭ অক্টোবর মেদিনীপুরে সরস্বতী শিশু মন্দির আয়োজিত প্রাক্তন বিদ্যার্থী পুনর্মিলন উৎসবে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। শ্রীকুলকার্ণী বলেন, এসময়ে দেশে বিভিন্ন মতাদর্শের এক সংঘাত চলছে। সেজন্য প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মিডিয়াতে যোগ দিয়ে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাকে প্রকাশ করারও দায়িত্ব নিতে হবে।

পুনর্মিলনের সবচেয়ে উপভোগ্য অনুষ্ঠান ছিল শিশুমন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনার পুনঃস্মরণ এবং জীবনের আগামী লক্ষ্য কি- তা বলা। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে স্বল্প কথায় স্মৃতিচারণ করেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে সুস্মিতা গোপ এবং আরও দু'একজন শিশুমন্দিরের আচার্য হয়েছেন। একটা বিষয় সকলেই একমত—তারা কেউই শিশু মন্দিরের সংস্কার ভোলেননি। কিছু করে দেখাতে চান। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে মেদিনীপুরে শিশুমন্দির প্রতিষ্ঠায় যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য তাদের সকলের নাম উল্লেখ করে স্মৃতিচারণ করেন আচার্য প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ। কয়েকজন ইতিমধ্যে প্রয়াত হয়েছেন— ধর্মচন্দ্র নাহার, স্বপন কুমার ঘোষ, ডঃ সুশীলা দাতে, স্বপন বসু, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। প্রয়াতদের আত্মার শান্তি কামনায় এক মিনিট নীরবতা পালন এবং শান্তি মন্ত্র পাঠ করা হয়। সঙ্ঘের জেলা সঙ্ঘচালক চন্দনকান্তি ভুঁঞা, কনক পানিগ্রাহী, শেখর সিংহ, সুব্রত চৌধুরী, সুশীতল সেন, দেবাংশু পতি, তারক দাস সরকার, পীযূষকান্তি বসু, মৃগাঙ্কশেখর মাইতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রাস্তাবিক ভাষণ দেন আচার্য বিদ্যুৎ কুমার মণ্ডল এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রদ্যুৎ কুমার ঘোষ।

সংস্কৃত ভারতীর বিজয়া সম্মেলন

বক্তব্য রাখছেন পথিক গুহ।

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ভারতবর্ষ যদি '১' এবং শূন্য (০) আবিষ্কার না করত তাহলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা কখনই কম্পিউটার তৈরি করতে পারত না। প্রাচীন ভারতের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা ও ভাগবতের মধ্যে জ্ঞানরাশি নিহিত রয়েছে। বিদেশী বিজ্ঞানীরা সংস্কৃত ভাষা আজও শিখছে জ্ঞান-বিজ্ঞানকে জানার জন্য, তার উদাহরণ এ্যাটম বোমার আবিস্কর্তা ওপেনহাইমার। সম্পূর্ণ গীতাই তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই প্রথম পরমাণু বোমা পরীক্ষার পর তিনি তার অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন, গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জুনের উপলব্ধির বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে।" উপরের কথাগুলি গত ৩ নভেম্বর 'সংস্কৃত ভারতী, দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত বিজয়া সম্মেলনে বলেন, বিখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাবন্ধিক পথিক গুহ। ২৬নং বিধান সরণীর কার্যালয়ে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রসঙ্গে উপরের কথাগুলি বলেন। শুধু সংস্কৃতই নয়, বাংলা ভাষার টিকে থাকা নিয়েও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলার মধ্যে বাংলার থেকে বেশি পরিমাণে হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা ঢোকানো হচ্ছে। যা এখন চলতি বাংলা ভাষা। তবে সংস্কৃতভারতী'র শুভ প্রয়াসকে শ্রীগুহ রাজনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য অভিমত প্রকাশ করেন। এদিন স্বাগত ভাষণ দেন সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তসংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। পৌরোহিত্য করেন মহানামব্রত মঠের শ্রীমদ্ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী মহারাজ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক কাশীনাথ দে।

চিত্তরঞ্জনে পথ-সঞ্চলন

বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্থানীয় শাখার পক্ষ থেকে দুর্গাপুজোর সূচনালগ্নে পথ-সঞ্চলনের আয়োজন করা হয়। অমলাদেহী মহল্লা থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পথ-সঞ্চলনটির সমাপ্তি ঘটে মিহিজামে। চিত্তরঞ্জন, মিহিজাম, রূপনারায়ণপুর প্রভৃতি এলাকা থেকে প্রায় ৫০০ জন স্বয়ংসেবক তাতে যোগদান করেন। প্রান্ত সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ বিপ্লব রায় জানান, গত কয়েক বছরে চিত্তরঞ্জন ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সঙ্ঘের কাজ বেড়েছে। তারই ফলশ্রুতিতে দুর্গোৎসবের প্রাক্কালে পথ-সঞ্চলনে এই অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছে।

'দেবদূত'-এর বস্ত্র বিতরণ

গত ১০ অক্টোবর সকালে কলকাতায় বাগবাজারে বলরাম মন্দির সংলগ্ন পথ পার্শ্বে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দেবদূত-এর উদ্যোগে পথ-শিশুদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণের অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এদিনের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্বোধন আশ্রমের স্বামী অমলাত্মানন্দ মহারাজ। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। দেবদূতের সম্পাদক জয়ন্ত সেন জানান, গত তিন বছর ধরে এই ধরনের সেবামূলক কাজ দেবদূত করে আসছে। সম্প্রতি বাগবাজারে হরনাথ হাইস্কুলের (প্রাইমারি বিভাগে) টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে সুশীল রায়, শৈলেন পাল, শশাঙ্ক দে প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দরবন জেলার প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সুন্দরবন জেলায় (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) এবছরের প্রাথমিক সঙ্ঘশিক্ষা বর্গ গত ২৩ থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত গ্রামীণ পরিবেশে করতাল নদীর ধারে হয়ে গেল। ২৪৪ জন শিক্ষার্থী ২৫ জন শিক্ষক ও ৬০ জন প্রবন্ধক অংশগ্রহণ করেন। ২৪৪ জন শিক্ষার্থী ৯১টি গ্রাম ও ৮টি ওয়ার্ড থেকে এই শিক্ষা শিবিরে যোগ দেয়। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বরিষ্ঠ সন্ন্যাসী ক্ষীরোদ মহারাজ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বর্গের উদ্বোধন করেন। দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিভাগ সঙ্ঘচালক ডঃ জয়ন্ত রায়চৌধুরী উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। স্থানীয় মানুষের সক্রিয় সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই বর্গ সবার মনে বিশেষভাবে রেখাপাত করেছে। দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচার প্রমুখ সুব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কাশ্মীর ও রামমন্দির বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

২৮ অক্টোবর ভারতসেবাশ্রম সঙ্ঘের সহসাধারণ সম্পাদক ও সমন্বয় বিভাগ প্রমুখ সন্ন্যাসী বিশ্বাত্মানন্দজীর (দিলীপ মহারাজ) আগমন বর্গের পরিবেশে এক অন্যমাত্রা এনে দেয়। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দিলীপ মহারাজ বলেন, আর এস এস ও বি এস এস একই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। স্বাধীনতার এতবছর পরেও দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মহীনতার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

এত যুবক নিজের পকেট থেকে প্রায় ৭০০ টাকা খরচ করে বর্গে এসেছে। সে বিষয়েও উল্লেখ করে তিনি সঙ্ঘকাজ বৃদ্ধির জন্য সকলকে আহ্বান করেন। তাঁকে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত শারীরিক প্রমুখ সুনীল সিং।

২৯ অক্টোবর বিকালে শিক্ষার্থীদের পথ সঞ্চলন দেখার জন্য আশেপাশের গ্রামের মানুষ রাস্তার দুপাশে ভীড় করেন। পরেরদিন সমারোপ উৎসবে বিভাগকার্যবাহ ডাঃ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও স্থানীয় মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা হিন্দুত্ববিরোধীদের আতঙ্কিত করে তোলে। স্থানীয় বি ডি ও এবং ও সি-র পক্ষ থেকে বর্গ বন্ধ করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপর চাপসৃষ্টি করা হয় বলে অভিযোগ। স্কুলকর্তৃপক্ষ যেমন ধৈর্যের ও সাহসিকতার পরিচয় দেন, সেই রকম সঙ্ঘকার্যকর্তারা ও প্রশাসনের কাছে পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়।

হিন্দু মহাসভার দুর্গাপুজো

হাওড়া জেলা হিন্দু মহাসভার উদ্যোগে রামরাজাতলা স্টেশন সংলগ্ন মহীয়ারী রোডে দ্বিতীয় বর্ষ সার্বজনীন দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়। মহাসভার হাওড়া জেলা সম্পাদক ধনঞ্জয় পাল মজুমদার ৫৫ জন পথ-শিশুকে নতুন বস্ত্র প্রদানের বন্দোবস্ত করেন। মহানবমীর দিন প্রায় ১৫০ জনকে অন্নভোগ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়।

দক্ষিণবঙ্গ বিদ্যাভারতীর ক্রীড়া সমাবেশ-২০১০

বিদ্যাভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখার প্রথম প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহ গত ১০ অক্টোবর বর্ধমান শহরের পুলিশ লাইন গ্রাউন্ডে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলো। এই ক্রীড়ানুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যাভারতীর পূর্বক্ষেত্রের প্রাক্তন সংগঠন সম্পাদক বিজয় গণেশ কুলকার্ণী। ১১টি জেলার ১৩২ জন বালক-বালিকা এতে অংশগ্রহণ করেন। এরা ৯ অক্টোবর সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট আধিকারিকগণসহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বৌদ্ধিক প্রমুখ অরবিন্দ দাশ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন ধরনের দৌড়, রিলে রেস, লৌহ বল নিক্ষেপ, উচ্চ লম্ফন ও দীর্ঘ লম্ফন ইভেন্ট প্রায় সব জেলার প্রতিযোগীরাই পুরস্কৃত হয়েছে। একমাত্র বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে চক্ ইসলামপুর শিশু মন্দিরের নওয়াজ শরিফ। শিশুদের এই প্রাণোচ্ছল সমারোহে অনুষ্ঠানের সভাপতি গৌরগোপাল রায় অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে স্থানীয় শিশু মন্দিরের ভবন নির্মাণে ১ লক্ষ টাকা দান করার কথা ঘোষণা করেন। পুরস্কার বিতরণ, ভাষণ এবং রাষ্ট্রবন্দনার মাধ্যমে প্রাদেশিক ক্রীড়া সমারোহের সমাপ্তি ঘটে। সমারোহের সঞ্চালনা করেন সরোজ কুমার দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমীর কুমার রাউত।

সমাবেশ সমাচার

স্বস্তিকায় শ্রীশ্রীকালীপুজো

প্রতি বছরের মতো এবারও সাপ্তাহিক স্বস্তিকার প্রয়াত সম্পাদক ভবেন্দু ভট্টাচার্যের প্রচলিত শ্রীশ্রী কালীপুজা ধুমধাম সহকারে স্বস্তিকা কার্যালয়ে পালিত হলো। বস্তুত এই কালীপুজো এখন স্বস্তিকার পাঠক, লেখক,

সাংবাদিক, বিজ্ঞাপনদাদা ও শুভানুধ্যায়ীদের বিজয়া সম্মেলনীতে পরিণত হয়েছে। সবই এক আছে, পুজোর আঙ্গিকে কোনও পরিবর্তন নেই। গত কয়েক বছরে পালটে গেছে শুধু পুরোহিত— ভবেন্দু ভট্টাচার্যের স্থানে নবকুমার ভট্টাচার্য। কুমারীপুজো দিয়েই শুরু। এখানে পুজোর সঙ্কল্প হয়— রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নামে। যজমান ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি স্বস্তিকার প্রকাশকও। পুজোকে কেন্দ্র করে গুণীজন সমাবেশ। এসেছিলেন— সাহিত্যিক কণা বসুমিশ্র, রমানাথ রায়, তথাগত রায়, সাংবাদিক নিশাকর সোম, সঙ্ঘের প্রাক্তন ক্ষেত্র সঙ্ঘচালক জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী। এছাড়া অমল কুমার বসু, কেশবরাও দীক্ষিত, ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈতচরণ দত্ত, প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পাল, কেন্দ্রীয় কার্যকরী মণ্ডলের সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী প্রমুখ। সব মিলিয়ে কয়েকশত ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বস্তিকার কর্মী ও শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক সহায়তায় পুজোর ব্যবস্থা হয়। সব মিলিয়ে এক পারিবারিক পুজো।

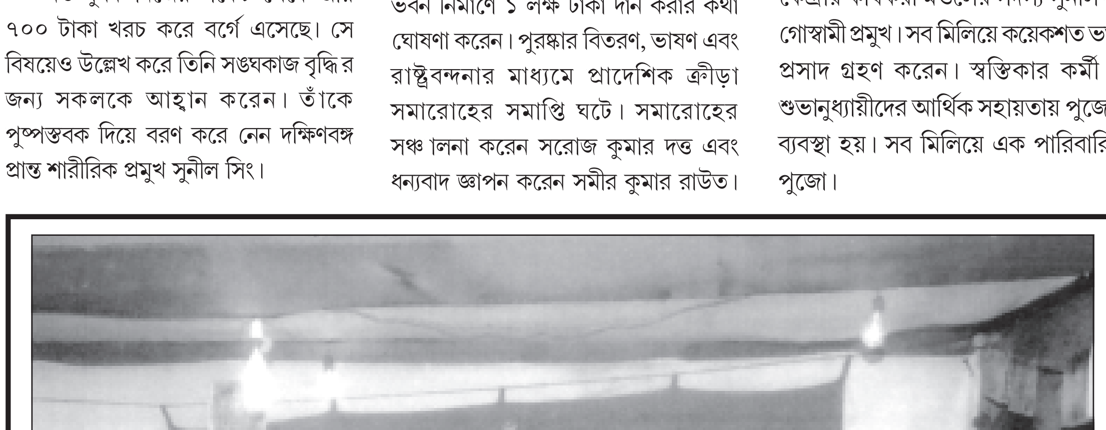

দুর্গা পুজোয় বেহালায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বুক স্টল।

কমনওয়েলথ গেমস ভারতের নবজাগরণ

।। জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।।

যাবতীয় দুর্নীতি ও বিতর্ককে পেছনে ফেলে কমনওয়েলথ গেমসে ভারতের দ্বিতীয়স্থানে উঠে আসা এক উজ্জ্বল দিকচক্রবালের সূচনা করেছে ভারতীয় ক্রীড়াজগতে। ৩৮টি সোনাসহ সবমিলিয়ে ১০১ টি পদক জিতেছে ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। তবে কমনওয়েলথের 'দৈত্য' অস্ট্রেলিয়াকে ধরা বোধহয় সম্ভব নয় ভারতীয়দের পক্ষে। বিশ্ব অলিম্পিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাকি বিশ্বের তুলনায় অনেকটাই এগিয়ে শুরু ও শেষ করে, কমনওয়েলথ গেমসে অস্ট্রেলিয়াও অনেকটা সেইরকম। তবে কমনওয়েলথ গেমসের প্রতিষ্ঠাতা দেশ ইংল্যান্ডকে টপকে যেতে পারাটা নিঃসন্দেহে ভারতের পক্ষে আত্মশ্লাঘার বিষয়।

সাইনা নেহওয়ালের ব্যাডমিন্টনে সিঙ্গলস সোনা জয়টাই ভারতের পক্ষে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। আবার ফাইনালের আগে পর্যন্ত সোনা সমান সমান ছিল ভারত ও ইংল্যান্ডের। তার দৌলতেই ভারত এবারের গেমসে শেষপর্যন্ত ইংল্যান্ডকে টপকে দ্বিতীয়স্থানে উঠে আসে পদক তালিকায়। এহেন কীর্তি যেন বিশ্বাস করতেই পারেনি বৃটিশ মিডিয়া সহ পাশ্চাত্যের সাংবাদিককূল। পরে অবশ্য তারা নিজেদের কলমে স্বদেশের কাগজে ভারতীয়দের প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। তবে উন্নাসিক বৃটিশ মিডিয়া একটু খোঁচা দিতেও ছাড়েনি। তারা মনে করে দেশের মাটিতে খেলার জন্যই ভারতীয়দের পক্ষে এই 'মাইলস্টোন' স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। পরের কমনওয়েলথ গেমস তাদের দ্বীপপুঞ্জের মাটিতে হবে, সেখানে ইংল্যান্ডই যথারীতি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসবে। মাঠের ক্রীড়াবিদদের চোখ ধাঁধানো পারফরমেন্সের মতো উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে যে আনুষ্ঠানিক শিল্পসুষমার উপস্থাপনা দেখা গেছে তাও হয়েছে বিশ্বমানের। এতদ্বারা 'গ্লোবাল মিডিয়া' ও বিশ্ববাসীকে বোঝানো সম্ভব হয়েছে যে ভারত চাইলেই এধরনের 'খেলা ইভেন্ট ভালভাবে সংগঠন করতে পারে।' ভবিষ্যতে অলিম্পিয়াড আয়োজনের বড় দাবিদার হতে চলেছে ভারত। কমনওয়েলথ গেমসের ভাল সংগঠন ও মাঠের গৌরবনৈপুণ্য আজ বিশ্বমঞ্চে ভারতের মাথা উঁচু করে দিয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের সব ক্ষেত্রের মতো খেলার মাঠেও এই ভারতীয়ত্বকেই দেখতে চেয়েছিলেন। আর খেলার মাঠ যে জীবনকেই শেখায়, প্রতিফলিত করে। তাই স্বামীজীর স্বপ্ন 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ' বোধহয় সাকার রূপ পেতে চলেছে।

এবারের গেমসে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোত্তম কীর্তির অধিকারী শ্যুটার গগণ নারাং। রাজ্যবর্ধন রাঠোর, অভিনব বিন্দ্রার পর গগন নারাংই পরবর্তী লন্ডন অলিম্পিককে পদকের জন্য নজরদার। দিল্লীর বুক থেকে চারটি সোনা ছিনিয়ে নিয়েছেন তিনি। তবে ভেডিড ডিকসন (সেরা অ্যাথালিটের স্বীকৃতি) খেতাব পাওয়া হয়ে ওঠেনি তার। কারণ অস্ট্রেলিয়ার মহিলা সাঁতারু অ্যালিসিয়া কাউটস পাঁচটি সোনা জিতে এবারের গেমসের সেরা ক্রীড়াবিদের মুকুট পরেছেন। তার স্বদেশীয় সাঁতারু লিজেল জোন্সও তিনটি সোনা জিতে

খেলার জগৎ

সাঁতারের মান অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। শ্যুটিংয়ে ভারতের ওঙ্কার সিংও তিনটি সোনা জিতেছেন। তার ওপরও নজর রাখতে হবে ভবিষ্যতে। সব মিলিয়ে এবার শ্যুটিং থেকে প্রাপ্তি ১৩টি সোনা। মেলবোর্নের আগের গেমস থেকে একটি কম।

দিল্লি গেমসে অভাবনীয় উন্নতির রেখাচিত্র তুলে ধরেন ভারতীয় কুস্তিগীররা। ফ্রিস্টাইল ও গ্রেকোরোমান মিলিয়ে ১০টি সোনা এসেছে, যার প্রায় সবকটাই হরিয়ানার সৌজন্যে। পুরুষ ও মহিলা দু' বিভাগেই হরিয়ানার কুস্তিগীররা তাদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে দম ফেলার সুযোগ না দিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে জমি ধরিয়ে দিয়েছেন। বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুশীল কুমার সবচেয়ে কম সময়ে চিৎ করে দিয়েছেন তাঁর বৃটিশ প্রতিদ্বন্দ্বীকে। মেয়েদের মধ্যে অলকা টোমারের শৈলী ও বীরত্ব চোখ টেনে নিয়েছে দর্শকদের। বক্সিংয়ে বিজেন্দারের ব্যর্থতা অবশ্য চিন্তায় রাখবে বক্সিংপ্রেমীদের। তবে বক্সিং রিং থেকে দুটি সোনা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক; যেখানে উগান্ডা, নাইজিরিয়া, ঘানা, ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ডের প্রতিযোগিরাও ছিলেন। তুলনায় হতাশ করেছেন ভারত্তোলকরা। এই ইভেন্টে কমনওয়েলথে ভারত এক বড় শক্তি। দিল্লির বুকে শক্তি উত্তোলনের কুশীলবরা জয়ধ্বজা উড়াতে পারেননি একচেটিয়াভাবে। কানাডা ও আফ্রিকার দেশগুলি এই বিভাগে ভারতীয়দের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছিলেন প্রতিটি ক্যাটাগরিতেই।

তবে 'কিং অব অল ইভেন্ট' অ্যাথলেটিক্সে ভারত যে এভাবে ঘুরে দাঁড়াবে তা বোধহয় অতিবড় স্বপ্ন বিলাসীও কল্পনা করেননি। সেই কবে ১৯৫৮-র কার্ডিফ কমনওয়েলথ গেমসে 'গ্রেট' মিলখা সিং ৪৪০ গজ দৌড়ে সোনা জিতেছিলেন। তারপর সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের অপেক্ষা। দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা যেন রঙ্গিন ফানুস হয়ে উড়ে বেরিয়েছে, নেহরু স্টেডিয়ামের বর্ণময় বাতাবরণে। বিশেষ করে মহিলাদের ডিসকাস ইভেন্টে, যেখানে 'ভিকট্রি পোডিয়ামে' তিন ভারত কন্যাকে দেবে মায়াবী বিভ্রম বলে মনে হচ্ছিল। কৃষ্ণা পুনিয়া ইতিহাস গড়লেন প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে সোনা জিতে। পরের দুটি স্থানও ভারতীয়রা দখলে রাখলেন, যা ভবিষ্যতে কখনও চোখে পড়বে কিনা সন্দেহ।

মেয়েদের রিলে ও দশ হাজার মিটার দৌড়েও অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতের অ্যাথলিটরা। রিলে দৌড়ে (৪৪০০) ফটো ফিনিশে নাইজিরিয়া ও জামাইকাকে পিছনে ফেলে ভারতের মেয়েরা স্টেডিয়ামে এক ঝলক টাটকা বাতাস বয়ে নিয়ে আসেন। আর ১০,০০০ মিটারে ব্রোঞ্জ এসেছে ভারতের ঘরে যা নিয়েও গর্ব করার অবকাশ আছে।

বস্তুত কমনওয়েলথ গেমসে অ্যাথলেটিক্সে মান সব অর্থেই বিশ্ব ও অলিম্পিক মানের। আফ্রিকা-ক্যারিবিয়ান দেশগুলি থাকায় জোরদার প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে প্রতিটি বিভাগেই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাথলেটিকরাও গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছেন। তাই ভারতের ২টি সোনা সহ পাঁচটি পদক প্রাপ্তি, নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। আর অন্যান্য খেলার মধ্যে ব্যাডমিন্টনে সাইনা, জ্বালাওটাং, অশ্বিনী পুনাপ্পা, টেবল টেনিসে অচান্ত শরঠ কমল, শুভজিৎ সাহারা সোনা জিতে দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন। টেনিসে কীর্তিখ্যাত লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি না পারলেও মান রেখেছেন সোমদেব দেববর্মন। আর যে দুটি খেলায় ভারতের কোনও অস্তিত্বই নেই সেই সাঁতার ও জিমন্যাস্টিকের প্রশান্ত কর্মকার ও আশীষ কুমারকে ভুললে চলবে না।

শব্দরূপ - ৫৬২

সুজাতা ভদ্র

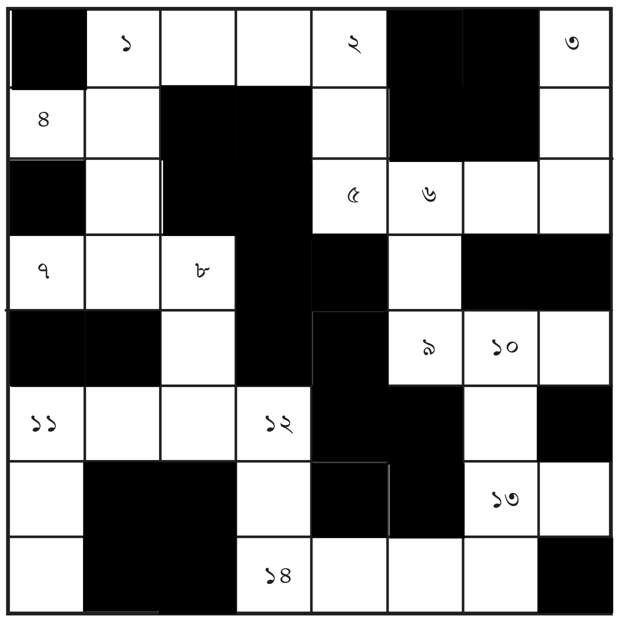

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ১. অর্জুন উভয় হস্তেই সমভাবে বাণ নিক্ষেপ করতে পারতেন বলে এঁর এই নাম, ৪. জ্যোতিষ ও গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিনী প্রাচীন বাংলার প্রখ্যাতা নারী, ৫. চন্দ্র, প্রথম দুয়ে ধূলা, ৭. ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্রের অন্যতম, একে-দুয়ে বৎসর, ৯. নৃত্যোপযোগী ত্রিপদী ছন্দবিশেষ, মধ্যে গরম পানীয়, ১১. প্রতিশব্দে নবযৌবন, ১৩. মনুষ্য জাতির আদিপুরুষ, ১৪. ব্যাস জননী, প্রথম দুয়ে মিথ্যার বিপরীত।

উপর-নীচ ঃ ১. একই শব্দে ঈশ্বর, চিরন্তন, পুরাতন, দুয়ে-চারে ইঙ্গ সন্ন্যাসিনী, ২. বিশেষত বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের পরিধেয় গৈরিক বসন, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ, ৩. সূর্য, ৬. রাধার শাশুড়ি, ৮. প্রতিশব্দে মঙ্গল, শুভ হিত, ১০. শ্রীকৃষ্ণের কন্যা, এঁর মাতা রুক্মিণী, মধ্যে ইঙ্গ কামরা, ১১. মুনি, যোগী, ১২. বেদনার প্রভাব।

সমাধান শব্দরূপ - ৫৬০

		গ	জা	জি	ন		প্র
না	র	দ			র		মী
	যু				ক	ম	লা
ধ	ন	প	তি			ঙ্গ	
	ন্দ			ম	দা	ল	সা
ক	ন	ক				চ	
ব		ণা			গা	ঙ্গী	ব
ন্ধ		দ	শা	ন	ন		

সঠিক উত্তরদাতা

নীলার্য্য (অন্তু) দাস
সাহাপুর, মালদহ
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৭০০০০৯
লক্ষণ বিষ্ণু, সিউড়ি, বীরভূম

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৬২ সংখ্যার সমাধান আগামী ২৯ নভেম্বর, ২০১০ সংখ্যায়

যাদের জন্মের ও ধর্মের ঠিক নেই তারাই আর এস এস-কে সিমি'র সঙ্গে তুলনা করে

শিবাজী গুপ্ত

কংগ্রেসের উঠতি নেতা রাহুল গান্ধী সমাজ সংগঠক ও ধর্ম সংরক্ষক প্রতিষ্ঠান আর.এস.এস.-এর সঙ্গে দেশে ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত জঙ্গি ও জল্লাদ মুসলীম সংগঠন সিমি-কে একাসনে বসিয়ে খুব আত্মতৃপ্তি লাভ করেছেন এবং সংবাদ মাধ্যম ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম তাকে ললাটে বিষ্ঠাবিন্দুর মতো স্থান দিয়ে নিজেদের চৌদ্দপুরুষের জন্ম সার্থক করেছে।

উঠতি বয়সের অনেক দোষ। উঠতি বয়সে মানুষের পঞ্চেন্দ্রিয় সু থেকে কু-এর দিকে, ভালোর চেয়ে মন্দের দিকে বেশী ধায়। চক্ষু কু-দৃশ্যের দিকে ধায়, কর্মের কু-কথা প্রিয় ঠেকে, নাসিকায় সুগন্ধের চেয়ে দুর্গন্ধে তৃপ্তি লাভ করে, জিহ্বা মিষ্টির চেয়ে টক স্বাদ বেশি পছন্দ করে; আর ত্বক মলয়বায়ুর চেয়ে মলের স্পর্শে পুলক অনুভব করে। সর্বোপরি কুকুরছানা বিষ্ঠা ভক্ষণে অভ্যস্ত হতে গিয়ে যেমন বেশি বিষ্ঠা উদরসাৎ করে, তেমনি রাজনীতিক্ষেত্রে হঠাৎ আবির্ভূত নেতা-নেত্রীদেরও কি বলতে যে কি বলবে, কি করতে যে কি করবে, সে বিষয়ে কোনও জ্ঞানগম্যি থাকে না।

সদ্যোত্থিত ভাবী কংগ্রেস নেতা, এবং অনতিবিলম্বে দিল্লীর গদীর ভাগীদার রাহুল গান্ধীর গোঁফ-দাড়ি গজিয়েছে। মুসলমানদের মন জোগাতে বিভিন্ন দলের উঠতি নেতারা দাড়ি গোঁফ রেখে মোল্লাপাড়ায় ঘোরাফেরা করে এবং মোল্লাপ্রীতি প্রকাশ করে। রাহুল গান্ধী এতদিন ক্লীনসেভড্ হয়ে রাজনৈতিক উত্তমকুমার সেজে ছোকরাছুকরিদের মন ভোলাতে স্কুল কলেজে ঘুরে বেড়াত। আর তাদের দর্শন ও স্পর্শন দিয়ে যুবক-যুবতী সমাজে নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে নেমেছিল। নেহরুগান্ধী বংশের চতুর্থ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রচার মাধ্যমের কাছে নিজের জনপ্রিয়তা গড়ে তোলার খেলায় মেতেছিল। কিন্তু মাদ্রাসা মসজিদের মুসলমান ছাত্রছাত্রীদের কাছে তার হেঁদুমার্কা চেহারা আকর্ষণীয় হবে না ভেবেই হয়তো ইসলামী কায়দায় দাড়ি গোঁফ গজাতে শুরু করেছে।

ভড়ং দিয়ে মন ভোলানো রাজনীতিকদের কারসাজি। রাহুল গান্ধীর হাতে খড়িও সেই ভড়ং দিয়েই শুরু হয়েছে। আর এই ভড়ং সর্বস্ব রাজনীতিই প্রধান অবলম্বন ছিল নেহরু গান্ধী গোষ্ঠীর। তার নানা (দাদু) সমাজতন্ত্রের ভড়ং দিয়ে রাজত্ব করে গেছেন। তার বহুরূপী কন্যা ইন্দিরা গান্ধী সেকুলারিজমের ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে কম্যুনিস্টদের হাত করে নির্বিবাদে জরুরী অবস্থা জারি করে বংশানুক্রমিক শাসনের ধারা বজায় রেখেছেন। তিনি জাগ্রত জনগণের গুঁতোয় গদী ছেড়ে পালালেন কিন্তু কম্যুনিস্টদের চক্রান্তে এবং

রাহুল গান্ধী

রাশিয়ার অর্থে জনতা দলে ভাঙন ধরিয়ে আবার গদি দখল করেন। অবশেষে শিখদের ধর্মস্থান স্বর্ণমন্দিরে মিলিটারী লেলিয়ে দেবার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ নিজের প্রাণ হারালেন। পুত্র রাজীব গান্ধী যোগ্য দাবীদারদের ধাক্কা মেরে সরিয়ে গদি দখল করে বংশধারা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন; কিন্তু অর্বাচীনের মতো শ্রীলঙ্কায় তামিল-সিংহলীদের বিবাদে মধ্যস্থতা করতে গিয়ে হনুমানের লেজের আগুনের মতো নিজের মুখ পোড়ালেন; হতমান নতশির হয়ে ভারতীয় সৈন্যদের মান ইজ্জত খুইয়ে দেশে ফিরিয়ে আনলেন। আর নিজের প্রাণ দিয়ে অপরিণামদর্শিতার খেসারত দিলেন।

এহেন মূর্খের ছেলে তর্কালঙ্কার হলেন রাজীব-নন্দন রাহুল গান্ধী।

ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রী বলে বংশবদ ক্রীতদাস সংবাদ মাধ্যম তাকে ইতিমধ্যেই যৌবরাজ্যে অধিষ্ঠিত করে ফেলেছে;— এখন শুধু মনমোহন সিংয়ের সরে দাঁড়ানো বাকী। আর সে আঁচ পেয়েই কেন্দ্রীয় সরকার ও কংগ্রেস দলের Trouble shooter তথা ত্রাণকর্তা বলে বিজ্ঞাপিত বঙ্গরত্ন প্রণব মুখার্জী আগাম কু-গাইতে শুরু করেছেন। তিনি নাকি রাজনীতি থেকে অবসর নিতে চাইছেন—একথা সংবাদ মাধ্যমের কানেকানে বলেছেন, আর সংবাদ মাধ্যম হাটেবাজারে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সে কথা প্রকাশ করে দিয়েছে। হঠাৎ তার মুখে একথা কেন? ইন্দিরা গান্ধী থেকে শুরু করে প্রত্যেক কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীর সেবা করে যিনি নেহরু গান্ধী পরিবারের সেবাইত আখ্যা পেয়েছেন, তার হঠাৎ এই মর্কট বৈরাগ্য কেন? তিনি মনে হয় ধরেই নিয়েছেন, ভাবী প্রধানমন্ত্রী রাহুল গান্ধীর বাল-সভায় তার মতো ত্রিকাল-দর্শী (ইন্দিরা-রাজীব-মনমোহন কাল) ভুষণ্ডী কাকের স্থান নাও হতে পারে! তবে তিন স্থির নিশ্চিত থাকতে পারেন— তার মতো পুরাতন ভৃত্যকে গিন্নী-মা তামাক-সেবা থেকে একেবারে বঞ্চিত করবে না;— রাষ্ট্রপতি না হলেও উপরাষ্ট্রপতি বা নিদেনপক্ষে যে কোনও ছোটখাটো রাজ্যের রাজ্যপাল পদের পিঁজরাপোলে তাকে আটক রাখবেনই।

'অনুতংবালভাষিতং' বলে রাহুল গান্ধীর সব কথাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যাঙের মুখে যেমন বর্ষার আগমন ঘোষিত হয়, তেমনি রাহুল গান্ধীর মুখ দিয়েও কংগ্রেসের অন্তরালবাসিনী অন্তরাত্মার অন্তর্দাহই প্রকাশ পেয়েছে— আর এস এস-এর মতো দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রতিষ্ঠানকে ভারতবিরোধী জঙ্গি জংলী ও জল্লাদের প্রতিষ্ঠান সিমি'র সঙ্গে একাসনে বসাবার ধৃষ্টতা থেকে। রাষ্ট্রধর্ম, জাতীয় ধর্ম সম্পর্কে তিলমাত্র যোগাযোগ অনুরাগ থাকলে এ ধরনের অর্বাচীন উক্তি কেউ

সিমি নেতা

করতে পারে না।

মূর্খতা, চাটুকারিতা, দাসত্ব ও ভৃত্যত্ব মনোবৃত্তি কতদূর শিকড় গাড়লে, কাণ্ডজ্ঞানহীনতা কোন্ নিম্নস্তরে পৌঁছলে রাহুল গান্ধীকে জননায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে তুলনা করা যায়—কংগ্রেসীরা তার প্রমাণ দিয়েছে। অবশ্য এর আগেই কংগ্রেসীদের মস্তিষ্কে যে ভাইরাস আক্রান্ত হয়েছে তা তো তাদের 'Indira is India' স্লোগান তোলা রোগেই ধরা পড়েছিল।

তথ্যের অধিকার নিয়ে তো খুব হৈ চৈ হচ্ছে। কিন্তু নেহরু-ইন্দিরা-ফিরোজ-সঞ্জয়-রাজীব-সোনিয়া সম্পর্কে তথ্য চাইলেই তথ্যকমিশন যেন বিছুটি লাগার ভয়ে হাত গুটিয়ে নেয়। তাদের উপর কোনও তথ্য চিত্রের অনুমতি পাওয়া যায় না। নেহরুর তথ্যনির্ভর ব্যক্তিগত জীবনী লিখতে গেলে লেখককে জেলে পোরা হয়। কারণ কি? এত ঢাক ঢাক গুড় গুড় কেন?

এদের অনৈতিক চরিত্র, অর্থনৈতিক জালজোচ্চুরি ফাঁস করতে চাইলেই ফাঁসিতে লটকাবার কিংবা গাড়ী চাপা দেবার আশঙ্কা থাকে।

প্রকৃত সত্য হলো, জন্ম ও ধর্ম সম্পর্কে গান্ধী নেহরুর পরিবারের বেশ কিছু অপ্রিয় সত্য লুকোবার আছে। কাশ্মীরে এই বংশের উৎপত্তি হলেও মোগল সম্রাটদের সঙ্গে খানাপিনা দহরম মহরমের ফলে এদের বংশে মুসলিম রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে বলে শোনা যায়। ইন্দিরা গান্ধী মুসলমান ফিরোজ খানের ঘরণী হবার পর সেই সম্পর্ক পাকা হয়। তার দুই সন্তানের জন্ম মুসলমানের ঔরসে। তাদের একজন আবার খৃস্টানী বিয়ে করে খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেছে বলে প্রকাশ। সেক্ষেত্রে তার পুত্র ও কন্যা খৃস্টান বলে গণ্য। ফলে হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান রক্তের সংমিশ্রণে এই বংশের রক্তের শুচিতাই হারিয়ে গেছে বলে ধরা চলে। এদের ব্লাড-গ্রুপ নির্ণয় করাই নাকি দুঃসাধ্য।

কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এদের মুসলিম প্রীতি ও খৃস্টান প্রেম থেকেই বোঝা যায়— হিন্দুরা এই পরিবারের কাছে অস্পৃশ্য শুধু নয়, শত্রু বলে পরিগণিত। হিন্দু-হিন্দুত্ব-হিন্দুস্থান এদের ভোগের বস্তু— যোগের বস্তু নয়। হিন্দুত্ব বিনাশে ইসলামী ও খৃস্টানী প্রবণতা এদের রক্তে মিশে রয়েছে। যাদের জন্মে ও ধর্মে কোনও ঐতিহ্য নেই, নিষ্ঠা নেই, পবিত্রতা নেই— তারা আর এস এস-কে সিমি'র সঙ্গে যে একসূত্রে বাঁধবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

(১১ পাতার পর)

এখানে ভাস্কর্য কিছুই প্রায় নেই, সামনে প্রবেশদ্বারের ওপরে স্বামীজিকল্পিত প্রতীক অংশটি ছাড়া। প্রতীকটি কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান ও যোগের সমন্বয়ে পরমাত্মদর্শনের দ্যোতক। অর্থাৎ জল, তার ওপর প্রস্ফুটিত পদ্ম, এর ওপর উদীয়মান সূর্য— এগুলিকে বেষ্টন করে আছে সাপ, মধ্যে হংস। বাইরের দেওয়ালে মাঝে মাঝে কিছু কিছু দেবদেবীর ভাস্কর্যমূর্তি সন্নিবদ্ধ।

শ্রীরামকৃষ্ণমন্দিরটি পশ্চিমবাংলায় স্থাপত্যসৌকর্যের এক অনন্য নিদর্শন। নিচের অংশ 'প্রাসাদ'রীতিতে গঠিত হলেও শিরোভাগের 'রত্ন'গুলির বেশির ভাগই 'চালা'-শৈলীর। প্রবেশমণ্ডপের শিরোদেশে তিনটি সুদৃশ্য 'চারচালা' সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'চালা'র ঢালু চালগুলি অনেকটাই ছত্রাকৃতি— কিছুটা রাজকীয় ছত্রের সাদৃশ্য পরিস্ফুটিত। যেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মাথার ওপর একটি বৃহৎ ছত্র স্থাপিত রয়েছে। ছত্রের চালের বাঁকানো ছাঁচা দেওয়াল থেকে অনেকটা নিচে প্রসারিত। ওপরে স্বর্ণাভ দণ্ড। কারুকার্য করা 'দোচালা' 'রত্ন' গর্ভগৃহের গম্বুজাকৃতি মূল 'শিখর'টির সঙ্গে যুক্ত। পার্শ্ববর্তী অপর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গম্বুজ এবং তার পাশে 'চারচালা'। উল্লেখ্য, সব 'চালা'রই শীর্ষে পতাকাদণ্ড শোভিত। 'রত্নে'র মধ্যে 'চালা'র পরেই আছে 'গম্বুজ'রত্ন। গম্বুজশীর্ষে আছে 'আমলক', 'ঘণ্টা', 'কলস' ও 'দণ্ড'। গম্বুজের বাইরের দেওয়াল ওপরে-নিচে খাঁজকাটা। প্রাসাদটির ছাদের কিনারাগুলোতে মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত করা হয়েছে 'গম্বুজরত্ন'। মূল প্রাসাদ থেকে উদ্গত সংকীর্ণ উচ্চ সৌধের মাথায় 'গম্বুজ'রত্নগুলো বসানো হয়েছে। এই সৌধের নিচের দেওয়ালে রয়েছে দুটি করে আয়তক্ষেত্রাকার 'চৈত্য'। মঠে স্বামীজির আবাসকক্ষ ছাড়া ব্রহ্মানন্দ, স্বামীজি, শ্রীমার স্মৃতিসৌধগুলিও দর্শনীয়।

কর্মযোগ

(১২ পাতার পর)

পারিশ্রমিক: রাজ্য সরকারের স্কেলে।

আবেদন জানাতে হবে ১৯ নভেম্বরের মধ্যে।

বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাবে www.nbu.ac.in ওয়েবসাইটে।

আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কুড়িটি বিষয়ে যথা, বাংলা এডুকেশন, ইংরেজি আরবি, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, জার্নালিজম্, মাস-কমিউনিকেশন, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইসলামিক স্টাডিজ/থিওলজি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং-এর মতো বিভিন্ন বিষয়ে।

পদের নাম : অ্যাসিস্ট্যান্ট্ প্রফেসর, অ্যাসোসিয়েট্ প্রফেসর এবং অস্থায়ী লেক্চারার।

বিস্তৃত বিবরণ সংস্থার ওয়েবসাইট www.aliah.ac.in-এ দেখা যেতে পারে।

আবেদন জানাবার শেষ তারিখ : ১৫ নভেম্বর ২০১০।

Swastika
15 November - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

বাংলাদেশে বাঘে-মানুষে

অরিন্দম মুখোপাধ্যায়

সকাল দশটার কাছাকাছি যখন হরিনগর বাজারে পৌঁছলাম তখন সেখানে বেশ উত্তেজনা। স্থানীয় ব্যবসায়ী কিরণ কর্মকার বললেন একজন জেলেকে বাঘে ধরেছিল। তার মৃতদেহ এখন জঙ্গল থেকে বার করে আনা হচ্ছে। বেশ উঁচু নদী বাঁধের উপর উঠে দেখলাম বাঁধ ধরে কাতারে কাতারে মানুষের সারি। হাতে টানা একটি ছোট নৌকা ঝড়ের গতিতে দক্ষিণপূর্ব কোণে এগিয়ে যাচ্ছে, পিছনে একটি বনবিভাগের লঞ্চ। পাশে দাঁড়ানো মামুন ভাই বললেন—'এ লঞ্চ টাইগার বাহিনীর। নবরে ওরাই আনতে গেছিল।'

বাংলাদেশের সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মানুষের মৃত্যু সম্প্রতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই বাঘের থাবায় জেলের মৃত্যুর খবর বাংলাদেশের সংবাদপত্র খুললেই চোখে পড়ে। এর অনেক কারণ আছে। সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব।

গত আগস্টের ২৯ তারিখে আমরাই এই ধরনের এক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। হরিনগর, সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলার মধ্যের এক গঞ্জ। যে জেলে-বসতির বাসিন্দার সেদিন বাঘের থাবায় মৃত্যু হয়েছিল সেই বসতি হরিনগর বাজার থেকে আধা কি.মি. দূরে। স্থানীয় এক যুবককে সঙ্গী নিয়ে বাইকে করে সেদিকেই রওনা দিলাম। জেলেপাড়ার শুরুতে ডান পাশে বেশ চওড়া খাঁড়িতে সুন্দরী গাছের ছড়ানো- ছেটানো বন। তা পার করেই দুই ধারে খড়ে ছাওয়া ঝুপড়ির সারি। ৪০-৪৫ ঘর হিন্দু জেলে আর ১৫ ঘর মতো মুসলমানের বসবাস। বৃষ্টিভেজা এঁটেলমাটিতে বাইক চালানো অসম্ভব দেখে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। ইতিমধ্যেই নবরঞ্জন (৩২)-এর মৃতদেহ জেলে পাড়ার এক পুকুরের পাশে শোয়ানো হয়েছে। মৃতদেহের এক পাশে মাটিতে আছড়ে পড়ে কাঁদছে নব'র স্ত্রী-মেয়েরা। কান্নার রোল উঠেছে আত্মীয়-প্রতিবেশীদের গলা থেকেও। নব'র দেহ ছেঁড়া কাঁথায় ঢাকা। চোখ আধ বোজা। বাম ভুরুতে বাঘের নোখের আঁচড়।

কি করে এমন হলো জিজ্ঞাসা করতে নব'র শেষ সময়ের সাথী পরিতোষ বলল সকাল ৭ টার দিকে তারা সুন্দরবনের পোড়াকাটিলা নদীতে মাছ ধরতে গিয়েছিল। ছয় জনের দলে নব'র ভাই ছাড়াও আরও চার জন ছিল। সকাল ৮ টার সময় বেশ কিছু পার্শে মাছ জালে ওঠে। সে সময় মাছের ঝাঁক টেনে তোলাতেই তারা ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগে জঙ্গল থেকে একটা বাঘ বের হয়ে বনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো নব'র উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে যায়। নব'র ভাই ঘটনার আকস্মিকতায় ভয় পেয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। পরিতোষরা চারজন নৌকা নিয়ে ভয়ে পালিয়ে এলাকায় ফিরে বন দপ্তরে খবর দেয়। সাতক্ষীরা রেঞ্জের কদমতলা বীট অফিস থেকে জেলেদের সঙ্গে বাহিনী গিয়ে গভীর জঙ্গলে নব'র আধ-খাওয়া দেহ উদ্ধার করে।

নব'র আর এক শেষ সময়ের সঙ্গী সিদাম কৌতূহলী জনতার ভিড় সরিয়ে নব'র মৃতদেহের কাছে আমাকে নিয়ে যায়। মৃতদেহের উপরকার কাঁথার আবরণ সরালে বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ে। নব'র নাভির খানিক নিচে থেকে তার শরীরের খানিক অংশ খুবলে খেয়েছে বাঘ। শরীর থেকে চুঁইয়ে পড়া টাটকা রক্ত তখনও জমাট বাঁধেনি। সিদাম মৃতদেহ ঢেকে দিয়ে বলে—'আমি দেখতে পারতেছি না, ওর পিঠে কিছুই নাই। সেটা সব খেইয়েছে। আর খানিক দেরি হলি আমরা আর ওরে শ্যাস দেখা দ্যখতে পাইতাম না।'

ইতিমধ্যেই আবার হালকা বৃষ্টি শুরু হওয়ায় নব'র উপর তার সঙ্গীরা একটা নীল প্লাসটিকের আচ্ছাদন দেয়। একজন এসে নব'র দুই চোখে তুলসী পাতার আবরণ দেয়।

সৎকার কখন-কিভাবে হবে জিজ্ঞাসা করতে পরিতোষ বলে— 'ওর ভাই এখনো নিখোঁজ। ওকে খুঁজতে আমাদের একদল আবার জঙ্গলে যাচ্ছে। সে এখন কেমন আছে কে জানে! ওরা ফিরলে নবরে আমরা দূরের চরে গোর দেব।' দাহ-সংস্কার না করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ওরা জানালো এই বর্ষার সময় শুকনো কাঠের অনেক দাম। সে পয়সা এ জেলে পাড়ার কারও নেই। তাই মাটিতেই সমাধি দেওয়া হবে নবরঞ্জন মণ্ডলকে।

এই হতদরিদ্র মানুষদের পাশে না আছে সরকার, না অন্য কেউ। দেড় বছর আগে এই বস্তিতে খৃস্টান এক সংস্থা একটি স্কুল খুলেছে। তাদের সঙ্গেই খৃস্টান পাদ্রীও এসেছিল। স্থানীয় হিন্দু প্রতিরোধের কারণে এখনও কারুকে ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হয়নি যা অন্যত্র তারা সাফল্য পেয়েছে।

সিডর-আইলার মতো প্রাকৃতিক বিপর্যয়, জনসংখ্যার প্রবল চাপ, নির্বিচারে বন ধ্বংস, বনদপ্তরের লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, সরকারের উদাসীনতার ফলে সুন্দরবন এবং তার ভিতরে বসবাসকারী প্রাণীকুল আজ বিপন্ন।

বংশপরম্পরায় মৎস্যশিকারী হিন্দু জেলেদের সঙ্গে নতুন করে বহু মুসলমানও এই সব পেশায় আসছে। ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ মাত্রাছাড়া আকার নিচ্ছে। কমছে প্রাকৃতিক খাদ্য। প্রাণ বাঁচাতে তাই তো সহজলভ্য শিকার মানুষ। যার ফলে প্রতিদিন এখন বাংলাদেশে নবরঞ্জনদের প্রাণ যাচ্ছে।

বাঘের নৃশংস হানার শিকার নবরঞ্জন মণ্ডল।

জেলেপাড়ায় পুকুরের পাশে আতঙ্কিত মানুষের ভিড়।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com